পথশিশু, ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক ২০২৪। শিল্পী : রফিকুন নবী

প্রথম আলো

বিশেষ ক্রোড়পত্র

মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২০২৫

Daily ePapers BD

Click here to join the channel

বৈষম্য পেরিয়ে

২০২৪ সালের বিপুল অভ্যুত্থান ছাত্র-জনতা পথে এসেছিল বৈষম্যের বিলোপ চেয়ে। এই ক্রোড়পত্রে লেখকেরা খুঁজে দেখছেন রাষ্ট্রের ক্ষমতা-কাঠামোয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও রাজনীতির অঙ্গনে বৈষম্যের রূপ। খোঁজার চেষ্টা করেছেন উত্তরণের উপায়।

ঢাকা হাজী ক্যাম্প সংলগ্ন উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে আবাসিক প্রকল্প

আশিয়ান সিটি

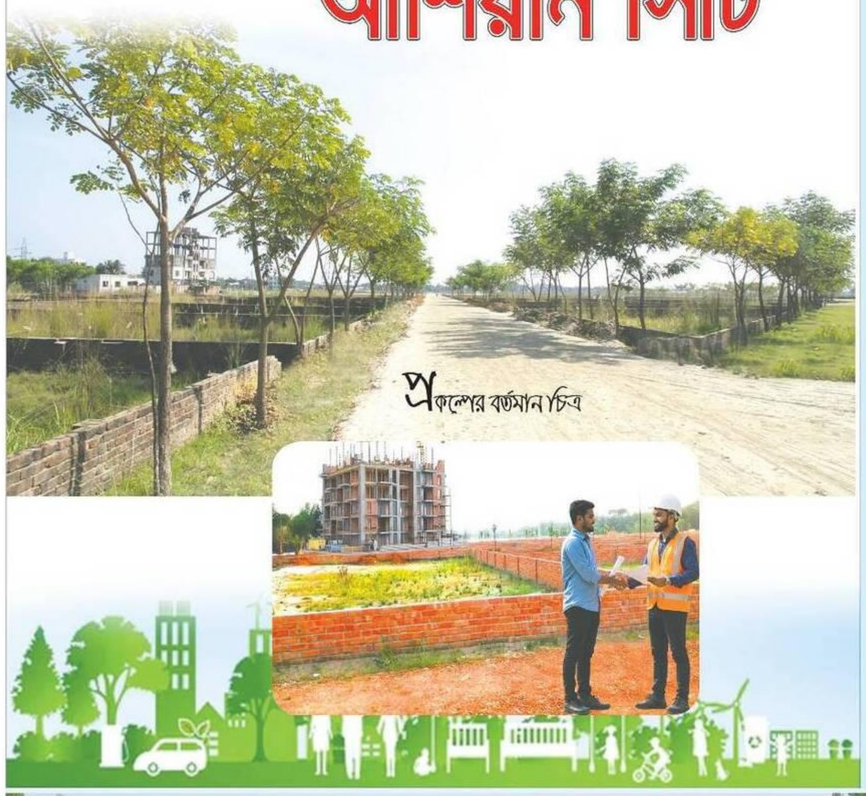

দেশের আবাসন খাতে
একটি জনপ্রিয় এবং
বিশ্বস্ত নাম আশিয়ান সিটি।
গুনগত মান এবং
প্রতিশ্রুতির সাথে একটি বৃহত্তর
মাইলফলক পেরিয়ে আজ
বিশ্ব দরবারে পরিচিতি পেয়েছে
আশিয়ান গ্রুপ হিসেবে।

সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবার প্রত্যয়

আশিয়ান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

স্বাদ এং স্বাস্থ্যের মেলবন্ধনে

আশিয়ান ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

আধুনিক মানের সুপারশপ

পয়সা বাজার

www.ashiyangroup.com

ashiyan group

আশিয়ান গ্রুপ

প্রধান কার্যালয় ঃ ইউনিকর্ণ প্লাজা, ৪০/২ নর্থ এভিনিউ,
গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন ঃ +৮৮ ৫৫০৫১৭২০-২৬।

উচ্চ প্রবৃদ্ধি, বৈষম্যবাদী বিকাশ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা

আনু মুহাম্মদ

অর্থনীতিবিদ ও সম্পাদক, সর্বজনকথা

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের সমাজ অর্থনীতির পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। প্রথাগত বিচারে 'অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি'র অনেকগুলো দিকই চিহ্নিত করা যায়। যেমন অর্থনীতির আকার বেড়েছে অনেক, কংক্রিট অবকাঠামোর বিস্তার ঘটেছে, জিডিপি বেড়েছে বহুগুণ, আমদানি-রপ্তানির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে, সড়কপথের বিস্তার ঘটেছে অনেক, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, বহুতল ভবন বেড়েছে দ্রুত, রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে পোশাকশিল্প বড় সাফল্য তৈরি করেছে, প্রবাসী আয় বৈদেশিক মুদ্রার বিশাল মজুত তৈরি করেছে, প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক তৎপরতায় ক্ষুদ্রঋণ ও এনজিও মডেল অনেক বিস্তৃত হয়েছে, নগরায়ণ বেড়েছে, দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সচলতা বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির গুণগত পরিবর্তন বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অনেক নতুন উপাদান যোগ করেছে। অনেক পেশা নাই হয়ে যাচ্ছে আবার অনেক পেশা নতুন যোগ হয়েছে।

অনলাইন যোগাযোগের উল্লম্ফনে গ্রাম-শহরের বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক তৎপরতায় এর প্রভাব পড়েছে ব্যাপক মাত্রায়। অসংখ্য মানুষের দৈনন্দিন জীবন এখন মুঠোফোন, ইন্টারনেট, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ইউটিউব, ওটিটি, বিকাশ, নগদনির্ভর হয়ে গেছে। অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইন সেমিনার-আলোচনা-পড়াশোনা, অনলাইন কেনাবেচা ব্যবসা-বাণিজ্য, অনলাইন সাংগঠনিক তৎপরতা, অনলাইন ধর্মীয় প্রচার দিনে দিনে বেড়েছে বহুগুণ। অনলাইন-অফলাইন বেচাকেনায় কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট, টিভি ইত্যাদির ব্যবসার প্রসার ঘটেছে, যার অনেকগুলোই আমদানি করা পণ্যের ওপরই নির্ভরশীল। বেসরকারি ক্লিনিক, ল্যাবরেটরি ও হাসপাতাল, বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, কনসালট্যান্সি ফার্ম ইত্যাদির বিস্তার ঘটেছে অনেক। এ সময়ে সিনেমা হল কমেছে, সিনেপ্লেক্স হয়েছে কিছু; পাঠাগার, থিয়েটার হল, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সেভাবে বাড়েনি, কিন্তু বহুগুণ বেড়েছে দেশি-বিদেশি খাবারের দোকান, শপিং মল; পাবলিক বাস বেড়েছে কিছু, কিন্তু তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে প্রাইভেট গাড়ি। সমাজে ধর্মচর্চা বেড়েছে আগের তুলনায় অনেক বেশি।

তবে জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি বা কথিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যেভাবে ঘটছে, তার সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্য অনেক বেশি। যেমন যে দশকে জিডিপির প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হারে ঘটেছে, সেই সময়ে বন বিনাশের হার দেখা গেছে সবচেয়ে উঁচু। নদী-নালা, খাল-বিল ও বনদূষণ, দখল ও বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। এ সময়েই দেশে একটি অতি ধনিকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে। তাদের বিত্তবৈভব যখন ঊর্ধ্বমুখী, তখন মাথা গণনায় দারিদ্র্যের প্রচলিত সংজ্ঞা বা কোনোভাবে টিকে থাকার আয়সীমার নিচে মানুষের সংখ্যা চার কোটির বেশি। যদি দারিদ্র্যসীমায় শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন যুক্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই অমানবিক জীবনে আটকে আছেন। গত এক বছরেও দারিদ্র্য ও বৈষম্য বেড়েছে।

গত কয়েক দশকে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে চার গুণের বেশি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের যথেষ্ট পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের সংস্থান হয়নি। দেশে কৃষকদের জীবনও বহু দিক থেকে বিপন্ন। ফসলের দাম, অনিশ্চয়তা, বিষের মধ্যে বসবাস, দখল-দূষণ সবই তাদের অস্থির করে রাখে। টিকে থাকার জন্য তাদের খুঁজতে হয় নতুন নতুন অবলম্বন। শিক্ষা ও চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে ব্যাপক মাত্রায়। দোকানদারি অর্থনীতির উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটছে, যেখানে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানচর্চা বাহুল্য জ্ঞান করা হয়। আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বাজার, ভোগবাদিতা ও নিয়তিবাদিতার প্রভাব বেড়েছে।

বাংলাদেশের এক কোটির বেশি মানুষ এখন প্রবাসী শ্রমিক। তাঁদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হলেও অধিকাংশের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার। দেশের ভেতর ৮৫ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষই এখন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ওপর নির্ভরশীল। রিকশা, ব্যাটারি রিকশা, বাস-ট্রাক, সিএনজি, টেম্পোসহ বিভিন্ন পরিবহন, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ছোট-বড় দোকানসহ 'টুকটাক অর্থনীতি' হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমজীবী মানুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। বেশির ভাগ কাজ অস্থায়ী, অনিয়মিত ও মজুরি খুবই নিম্নমাত্রার। দেশে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এখনো অনেক দূরের বিষয়। শ্রমিক, শিক্ষকসহ প্রায় সব পেশাতেই মজুরি-বেতন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে নিচের দিকে। দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় উচ্চ ব্যয় জনসংখ্যার একটি বড় অংশের জন্য খুবই বিপদের কারণ। স্বজনের চিকিৎসা বা সন্তানদের শিক্ষিত করাতে গিয়ে অনেকেই দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে।

> মনে রাখতে হবে, বৈষম্য আর বৈচিত্র্য এক কথা নয়। সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য আমাদের শক্তির জায়গা।

এসব কারণে সমাজে শ্রেণিবৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটেছে উৎকটভাবে। জিডিপিতে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের অংশীদারত্ব কমে গেছে এবং শীর্ষ ১০ শতাংশের হাতে আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যার সিংহভাগ আরও শীর্ষ ১ শতাংশের দখলে। এদের কারণে দেশের বিপুল সম্পদ লুণ্ঠিত ও পাচার হয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে, বারবার স্বৈরশাসনের জাঁতাকলে আটকে গেছে দেশ। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা, জুলুম অব্যাহত থাকছে।

সামাজিক বৈষম্যের আরেকটি বড় দিক হচ্ছে লিঙ্গবৈষম্য। গত কয়েক দশকে সব ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ ও দৃশ্যমান সচলতা বেড়েছে। শহর ও গ্রামে সরাসরি মজুরি শ্রমিক হিসেবে নারীর উপস্থিতি এখন তুলনায় অনেক বেশি।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদেরও উপার্জনমুখী কাজে অংশগ্রহণ বেড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের সাফল্য বেশি হলেও তার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। এই থেমে যাওয়া বা ঝরে যাওয়ার পেছনে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, অনুশাসন, নারীবিদ্বেষী মতাদর্শিক আধিপত্য কাজ করে। আইনগত বিধিব্যবস্থাও বৈষম্যমূলক। এখনো সম্পত্তি-সন্তানের অধিকার, খেলাধুলা-কর্মসংস্থান এবং চলাফেরার পথে নানা প্রতিবন্ধকতা ছড়ানো। গ্রাম-শহরে জমি, কাজ ও আশ্রয় থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের শিশু ও নারীর অবস্থা তুলনায় আরও বেশি নাজুক। লিঙ্গীয় বৈচিত্র্য হুমকির মুখে। নারীর সচলতা-সক্রিয়তাবিদ্বেষী বিভিন্ন গোষ্ঠীর হামলা-হুমকির পাশাপাশি ঘরে-বাইরে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনাও বড় উদ্বেগের বিষয়।

আরেকটি বৈষম্যের এলাকা আমরা দেখি জাতিগত-ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানে কয়েক দশকে বহু দফা সংশোধনী হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া অন্য জাতিসত্তা ও ভাষাভাষীর অস্তিত্ব সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নয়। উপরন্তু তাদের জমি, ভাষা, সংস্কৃতি—সবকিছুই দখলদারদের থাবার মুখে, আছে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার হুমকি।

সামাজিক বৈষম্যের আরেক বড় ক্ষেত্র ধর্মীয় বৈষম্য, দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জন্য অশান্তি, বিদ্বেষ, সহিংসতার অন্যতম উৎস। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম পরিচয়ই রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি হবে, এই হুংকার বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষতবিক্ষত করছে বারবার। বৈচিত্র্যের ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতপক্ষে এতে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী যে নিরাপদ থাকে, তা নয়; ভিন্ন ধর্মের মানুষই যে শুধু বৈষম্যের শিকার হয়, তা নয়। একই ধর্মের মধ্যেও সংখ্যালঘু বা দুর্বল গোষ্ঠী বৈষম্য-নিপীড়নের শিকার হয়। ভিন্নমত, ভিন্ন তরিকা, ভিন্ন ধর্মের দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটানো এ রকম বৈষম্যবাদী ব্যবস্থার ফলাফল।

বৈষম্যের বিরোধিতা করে যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে, সেই বৈষম্য দূর করার পথে আমরা কতটুকু এগোলাম? ছবি : প্রথম আলো

আগেই বলেছি, বনজঙ্গল, সরকারি জমি, সাধারণ সম্পত্তি, নদী-নালা, খাল-বিল, খোলা মাঠ—সবই এখন দখলের লক্ষ্যবস্তু। বলা বাহুল্য, এই দখল-সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক তৎপরতা রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যেই সংঘটিত হয়। এগুলো তাই বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, জাইকার হাত ধরে নয়া উদারতাবাদী বা পুঁজিপন্থী অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতিমালায় সব সাধারণ সম্পত্তির মুনাফামুখী দখলের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। এসব নীতির কারণেই গত কয়েক দশকে কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে পেরেছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিদ্যুৎ খাত, অবকাঠামো, কৃষি, বন্দর বহুজাতিক পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। উন্নয়নের নামে প্রাণবিনাশী প্রকল্প এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির ধারা এখনো অব্যাহত আছে। সাম্রাজ্যবাদী সামরিক-বাণিজ্যিক প্রকল্প আরোপের চেষ্টা এখন বেড়েছে।

আমরা দেখছি জনস্বার্থ ও প্রাণ-প্রকৃতিবিরোধী বন্দোবস্তে একদিকে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর জৌলুশ, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বিভীষিকা। পরিচয়ের রাজনীতির দাপট বৃদ্ধির ফলে আমরা দেখছি শুধু (ধর্মীয়, লিঙ্গীয় বা জাতিগত) পরিচয়ের কারণে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার জাল। দেখছি একদিকে সম্ভাবনার বিকাশ অন্যদিকে দেশি-বিদেশি দখলদারদের স্বার্থে উল্টো যাত্রার কর্মসূচি। এগুলো একটি নির্মম বৈপরীত্যের মধ্যে বাংলাদেশকে নিক্ষেপ করেছে। দেশে এযাবৎ অনেক সামরিক-নির্বাচিত-অনির্বাচিত সরকারের পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু এসব নীতির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয়নি, নতুন কোনো গতিমুখ সৃষ্টি হয়নি। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তাদের চিন্তা ও উদ্যোগে এর কোনো পরিবর্তনের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে রাষ্ট্ররাজনীতিতে এখন যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। গত সরকারের সময় সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক—সব ক্ষেত্রে একদলীয় আধিপত্যের আড়ালে সব রকম বৈষম্যবাদী, জাতিবিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক, নারীবিদ্বেষী যে অপশক্তিগুলোর বিস্তার ঘটেছে, তারা এখন অনেক বেশি দাপট নিয়ে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করছে। এরা মাজার-দরবার ভাঙচুর করছে, মন্দির-পূজামণ্ডপে হামলা করছে; শিল্পকর্ম, ম্যুরাল, ভাস্কর্য ভাঙছে; গান-নাটক উৎসব বন্ধ করতে সব সন্ত্রাস চালাচ্ছে, নারীর স্বাধীন চলাফেরায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, সংখ্যালঘু জাতি ও ধর্মের মানুষদের আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখলের ব্যবস্থা করছে। উদ্বেগ ও ক্ষোভ আরও বেশি হওয়ার কারণ, এসব হামলা, সন্ত্রাস, ভাঙচুর ঘটলে সরকারকে হয় নিষ্ক্রিয় দেখা যাচ্ছে অথবা এগুলোর পেছনে দেখা যাচ্ছে প্রশাসনের সরাসরি সমর্থন। বৈষম্যবাদী রাজনীতির দাপট বাড়ছে, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী মতাদর্শকে মহিমান্বিত করে জোরজবরদস্তি, ট্যাগিং, মব ভায়োলেন্স, নারী ও জনবিদ্বেষী তৎপরতা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মাত্রায়।

মনে রাখতে হবে, বৈষম্য আর বৈচিত্র্য এক কথা নয়। সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য আমাদের শক্তির জায়গা। এই বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে এবং সব রকম বৈষম্যের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। সমাজে যে বৈষম্য, নিপীড়ন ও আধিপত্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, তার চিহ্ন দেয়ালে দেয়ালে তুলে ধরেছেন এ সময়ের কিশোর-তরুণেরা। তাকে তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক শক্তিতে পরিণত করাই এখন আমাদের কাজ।

স্বর্ণের ছোঁয়ায়, তোমার উপমায়,
বদলে দিলে যে আমায়...

স্যান্ডালিনা
সোপ

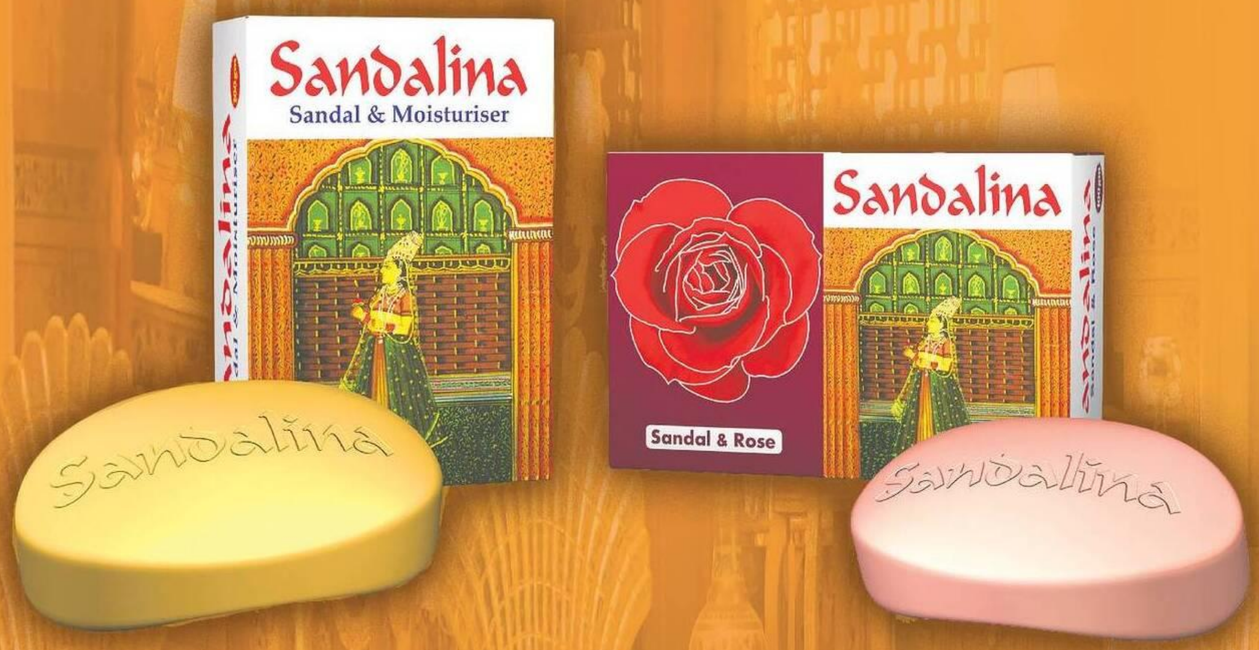

রূপচর্চায় আভিজাত্য...

us on /Sandalina

KOHINOOR CHEMICAL

বৈষম্যের খাঁচা আদৌ কি আমরা ভাঙতে চাই

গওহার নঈম ওয়ারা
লেখক ও গবেষক

শিক্ষার্থীরাও শ্রেণিকক্ষে ও রাস্তাঘাটে নানা বৈষম্যের শিকার হয়। ছবি : প্রথম আলো

বাংলাদেশে বৈষম্য বলতে আমরা সাধারণত আয়, সুযোগ বা সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য বুঝি। কিন্তু এই বৈষম্যের সবচেয়ে গভীর ও নীরব রূপটি লুকিয়ে আছে আমাদের চিন্তায়, সংস্কৃতিতে ও দৈনন্দিন আচরণে। এটিকে বলা যায় অন্তর্নিহিত বা মানসিক বৈষম্য।

চাকরিপ্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেছে। প্রায় ১০০ জনের মধ্য থেকে মাত্র ৫ জনকে ডাকা হয়েছে মৌখিক পরীক্ষার জন্য। তাঁদের একজন নারী। লিখিত পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকেও তিনি এগিয়ে।

ইন্টারভিউ বোর্ডে আমি ছাড়া সবাই নারী। তাঁদের প্রায় সবাই উপমহাদেশের প্রখ্যাত জেন্ডারবিশেষজ্ঞ প্রয়াত কমলা ভাসিনের দীক্ষাপ্রাপ্ত। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, চারজন পুরুষ প্রার্থীকে যেসব প্রশ্ন করা হয়নি, নারী প্রার্থীকে সেসব প্রশ্ন করা হচ্ছে।

প্রার্থীকে সক্ষমতা যাচাইমূলক প্রশ্নের বদলে তাঁর পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন করার প্রতিযোগিতায় সবাই মেতে উঠলেন। তাঁর বিয়ের পরিকল্পনা, বিয়ের প্রথম বছরে সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন করা হলো। মা-বাবা মফস্সলে থাকেন, তাঁরা ঢাকায় এসে মেয়ের সঙ্গে থাকতে চাইবেন কি না; ভবিষ্যৎ স্বামীর যদি বদলির চাকরি হয়, তাহলে তিনি এই চাকরির হ্যাপা সামলাতে পারবেন কি না, তা-ও বাদ গেল না। এ রকম ঘটনা এক-দুবার নয়, বারবার ঘটেছে।

নারীর প্রতি বৈষম্য না করার প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আমরা যতই অংশগ্রহণ করি না কেন, আমাদের মনমগজে গেঁথে থাকা বৈষম্যের লেজ সোজা হওয়ার নয়। এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বা সোশ্যালাইজেশন প্রসেস আমাদের মগজে-মেজাজে গজানো বৈষম্যের চারায় সার-পানি দিতে থাকে। তাতে গাছটি তরতর করে বড় হতে থাকে।

এই বিষবৃক্ষ এতই 'পয়মন্ত' যে সেটি চিন্তায়, ভাবনায়, মননে সংস্কৃতির পরতে পরতে বৈষম্যকে বসিয়ে দেয়। ফলে মনের অজান্তেই আমরা বৈষম্যমূলক আচরণ করি। একেই মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, অবচেতন পক্ষপাত বা আনকনসাস বায়াস। সেখান থেকেই চাকরির সাক্ষাৎকারে নারী প্রার্থীকে বিব্রতকর প্রশ্ন করা হয়।

যাঁরা ফার্মগেট থেকে বাসে উঠে এদিক-ওদিক যাতায়াত করেন, তাঁরা লক্ষ করবেন, স্কুল-কলেজে যাওয়ার সময় শুধু ড্রেস দেখার পর বাসের চালকের সহকারী বা কন্ডাক্টরের গলার স্বর ও কথা বলার ভঙ্গি বদলে যায়। বাজারে কদর বেশি, এমন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচরণ আর কম কদরের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচরণের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে।

আমাদের স্কুলেও দেখেছি, ঈদের ছুটির পর অনেকেই স্কুলড্রেসের বদলে ঈদের জামা পরে আসত। সেদিন শিক্ষকদের চোখেমুখে একধরনের অচেতন পক্ষপাতের ছাপ পড়তই। আমাদের অবচেতন মন কীভাবে যেন শিখিয়ে দিয়েছিল, পুরুষেরা পরিবারের কর্তা হবে, মেয়েদের দায়িত্ব সীমিত।

ভিন্ন ধর্ম, জাতি বা পেশার মানুষকে মনে মনে অনুৎকৃষ্ট বা দ্বিতীয় শ্রেণির ভাবার কাজটাও শুরু হয় অবচেতন পক্ষপাত থেকে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে বাড়ি ভাড়া না দেওয়া, ফ্ল্যাট বিক্রি না করা, শুভেচ্ছা বিনিময় থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি নানা কর্মকাণ্ড দেখা যায়।

বৈষম্য মগজে বাসা বাঁধে কীভাবে

আমাদের লোকগাথা, রূপকথা, প্রচলিত বাগ্‌ধারা, শ্লোক—সর্বত্রই হয় বৈষম্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে অথবা বৈষম্যের প্রচার-প্রসার করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'গরিবের আবার মান-ইজ্জত কী'—এসব কথা আমাদের মনের গভীরে আটকে থাকা এক অবচেতন বৈষম্যমূলক মনোভাবের আলামত।

আমাদের প্রবাদ-প্রবচন ও লোককথাও এই বৈষম্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

১. লিঙ্গবৈষম্য

মেয়েদের স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল ও অক্ষম হিসেবে তুলে ধরার জন্য বলা হয়, 'মেয়ে মানুষের মাথায় বুদ্ধি কম।' নিজের গর্ভে বা ঔরসে জন্ম নেওয়া মেয়েটিকে লক্ষ্মী বললেও তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকে বলি, 'মেয়ে মানেই পরের ধন।' মেয়েকে পরিবারের সম্পদ নয়, বোঝা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। মেয়েদের একটা 'লক্ষণরেখার' মধ্যে আটকে রাখার ইচ্ছা থেকে বলি, 'নারীর স্থান রান্নাঘরে'। এটা মেয়েদের ঘরোয়া কাজেই সীমাবদ্ধ রাখার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

২. দারিদ্র্যভিত্তিক বৈষম্য

দরিদ্র মানুষের সম্মান অস্বীকার করতে বলি 'গরিবের আবার ইজ্জত কী?' ধনী-গরিব ভাগ্য দিয়ে নির্ধারিত, তাই দরিদ্রদের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব নয়, এমন চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলা হয় 'যার যতি তার গতি'। এত কিছু বলার পরও মনে হয় আরও কিছু বলা দরকার, তাকে তুচ্ছতার শেষ পর্যায়ে নিয়ে পূর্ণ হতাশ করতে বলা হয় 'গরিবের ঘরে শুয়োরও বাঁচে না'।

> 'বঞ্চিত' নিজেই কি কখনো 'বঞ্চনাকারী' হতে পারে? উত্তর হলো, পারে। হরহামেশা হচ্ছেও।

৩. জাতিগত ও পেশাভিত্তিক বৈষম্য

কৃষিজীবী মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করতে বলা হয় 'সেঠো ছেলে, খেতের মেয়ে'। কম আয়ের পেশাজীবী বা প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীকে গালি হিসেবে ব্যবহৃত শব্দসমষ্টি 'ডোমের বেটা' বা 'চামার'। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায় যখন বলা হয়, 'কুলি-মজুরের আবার সম্মান কিসের?'

৪. বয়স ও প্রজন্মভিত্তিক বৈষম্য

যারা বয়সে ছোট বা তরুণ, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে বাইরে রাখার জন্য আমরা বলে থাকি, 'হাঁটুর বয়সী মানুষ, ওরা কী জানে।' আবার 'বড়'দের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে কর্তৃত্ববাদী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, 'বড়রা ভুল করলে উচ্চবাচ্য করা যাবে না, মানতে হবে।'

৫. লোককথার ভেতরের বৈষম্য

অনেক গল্পে ধনী রাজপুত্র বা রাজকন্যা বুদ্ধিমান, সুন্দর ও যোগ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়; গরিব চরিত্রগুলো থাকে অসহায় বা নির্ভরশীল। 'গরিবের ছেলে রাজকন্যাকে বিয়ে করবে'—এমন কাহিনি সাধারণত অলৌকিক শক্তি বা ভাগ্যের জোরে ঘটে, বাস্তব দক্ষতা বা যোগ্যতা দিয়ে নয়।

এসব সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে বেড়ে উঠতে উঠতে আমরা অনেক সময় না জেনেই অন্যকে 'কম যোগ্য', 'কম গুরুত্বপূর্ণ' বা 'নিচু শ্রেণির' ভাবতে শুরু করি। যেমন কেউ যদি গ্রামীণ উচ্চারণে কথা বলে, অনেকেই ধরে নেয় সে 'অশিক্ষিত' বা 'কম বুদ্ধিমান'। আবার গায়ের রং, পোশাক বা পেশার ওপর ভিত্তি করে মানুষকে বিচার করা—এগুলোও মানসিক বৈষম্যের লক্ষণ।

মানসিক বৈষম্য সমাজে কয়েকভাবে কাজ করে। বৈষম্যের শিকার গোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে, উচ্চবিত্ত বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সহানুভূতি কমিয়ে দেয়। সাধারণভাবে মানুষ মনে করে, 'এটাই স্বাভাবিক', এটাই 'বিধির বিধান'। সে মেনে নেয় বৈষম্যকে। ফলে ন্যায়বোধ বিকৃত হয়। মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় না। এ কারণে শোষণ চলতে থাকে। ন্যায়বিচার ও সমতা 'তাত্ত্বিক' থেকে যায়, বাস্তবে প্রয়োগ হয় না। সহানুভূতি ও মানবিক সম্পর্ক দুর্বল হয়—একজন অন্যের কষ্ট বুঝতে শেখে না।

'বঞ্চিত' নিজেই কি কখনো 'বঞ্চনাকারী' হতে পারে? উত্তর হলো, পারে। হরহামেশা হচ্ছেও। পিয়েরে বুর্দিয়ুর তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজে ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রতীকী মূলধন প্রজন্মের পর প্রজন্মে পুনরুৎপাদিত হয়। বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি ক্ষমতায় এসে নিজের শ্রেণি বা গোষ্ঠীর অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পুরোনো কাঠামোকেই কাজে লাগায়।

বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি অনেক সময় নিজের ভেতরে 'হীনম্মন্যতা' বা 'আঘাতের স্মৃতি' বহন করে। ক্ষমতায় গেলে সে অবচেতনভাবে প্রতিশোধমূলক বা প্রতিসাম্য মনোভাব গ্রহণ করতে পারে, 'যখন আমি নিচে ছিলাম, আমাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি; এখন আমি দেখাব, ক্ষমতা কাকে বলে।'

এটাকে 'সাইকোলজিক্যাল কমপেনসেশন' বা 'ইন্টারনালাইজড ওপ্রেশান' বলা হয়। অর্থাৎ দীর্ঘদিনের দমন-অবমূল্যায়ন তার মানসিক কাঠামোয় এমনভাবে লেপটে যায় যে সে নিজেও অবচেতনভাবে একই কাঠামো পুনরুৎপাদন করে। যে রাষ্ট্র বা সমাজে বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ক্ষমতার কাঠামোও বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য তৈরি থাকে। ফলে যখন কোনো 'বঞ্চিত' গোষ্ঠীর কেউ ক্ষমতায় আসে, সে এই কাঠামোর অংশ হয়ে যায়। সিস্টেম তাকে শিখিয়ে দেয়, 'এই নিয়ম মেনে চললেই টিকে থাকবে।'

তাই ব্যক্তি পরিবর্তন হলেও কাঠামো পরিবর্তিত না হলে বৈষম্য অটুট থাকে। 'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে?'—আদতে এটিই মূল প্রশ্ন নয়। মূল প্রশ্ন হলো আমরা বৈষম্যের খাঁচাটা ভাঙতে চাই কি না। কায়মনে চাইলে পথ আর পন্থার অভাব নেই।

তিন দশকের বেশি সময় ধরে **বাংলাদেশ** এবং বিশ্বের **৬৫** টি দেশে স্বাস্থ্য সেবায় নির্ভরতার প্রতীক রেনাটা পিএলসি
সম্ভাবনাময় তারুণ্যের হাত ধরে

বিপণন ও **ব্যবস্থাপনায়** কর্মরত রেনাটা-এর সিংহভাগ কর্মীই **তরুণ**

১৬০ জন তরুণ **বিজ্ঞানীর** উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে **রেনাটা**

তরুণ নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ২৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে রেনাটা শুরু করেছে **ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর** প্রোগ্রাম

সামাজিক দায়বদ্ধতায় **একধাপ এগিয়ে**
রেনাটা-এর ৫১ ভাগ লভ্যাংশের অংশীদার সাজেদা ফাউন্ডেশন

অদম্য তারুণ্য
অদম্য রেনাটা

Scan for More

Renata PLC

সিটি ব্যাংক পিএলসি
সিটি ব্যাংক সেন্টার
২৮ গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
১৬২৩৪ citybankplc.com
সিটি ব্যাংক
মেকিং সেন্স অব মানি
ইন্স্যুরেন্স করলে সিটি-তে সুরক্ষা পাবেন নিশ্চিতে
আপনার ও আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার পথটা হোক আরও নিশ্চিত। সারাদেশে সিটি ব্যাংকের যেকোনো শাখা ও উপশাখা থেকে এখন সহজেই নিতে পারবেন নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্স্যুরেন্স পলিসি।
সবচেয়ে বেশি ইন্স্যুরেন্স পার্টনার
সাধারণ ও শরিয়াহ ভিত্তিক ইন্স্যুরেন্স
দ্রুততম ও সহজ প্রসেসিং
নিরাপদ ভবিষ্যতের শুরু হোক এখনই।
বিস্তারিত জানতে আপনার নিকটস্থ সিটি ব্যাংক শাখা ভিজিট করুন অথবা QR কোড স্ক্যান করুন
সিটি ব্যাংকই ভরসা
লাইফ ইন্স্যুরেন্স পার্টনার
আকিজ তাকাফুল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি
Akij Takaful Life Insurance PLC
আমরা একটি পরিবার
ডেল্টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
গার্ডিয়ান
নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স পার্টনার
city insurance
Insuring your future... Today
City Insurance PLC.
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
রিলায়েন্স ইনস্যুরেন্স

অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে, কমানোর পথ কী

সেলিম রায়হান

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পথই তাঁদের বাসস্থান, তাঁদের রান্নাঘর। ছবি : প্রথম আলো

স্বাধীনতার পর গত প্রায় সাড়ে পাঁচ দশকে বাংলাদেশ প্রায় সব ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু এই সাফল্যের বিপরীতে একটি উদ্বেগের বিষয়ও ক্রমেই বেড়েছে, তা হলো বৈষম্য। সম্পদ, আয়, সুযোগ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এমন মাত্রায় পৌঁছেছে, যা সামাজিক ন্যায়বিচার, অংশগ্রহণ ও স্থিতিশীল উন্নয়নের ভিত্তি দুর্বল করে দিচ্ছে।

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, ন্যায্যতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত না হলে প্রবৃদ্ধির ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। গণ-অভ্যুত্থান একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে এনেছে—কাদের জন্য উন্নয়ন? কারা সিদ্ধান্ত নেবে এবং কারা সুফল পাবে? গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই কেবল অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের সঙ্গেও জড়িত।

কেবল আয় নয়, বৈষম্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত

বাংলাদেশে বৈষম্য নিয়ে আলোচনা প্রায়ই আয়বৈষম্যের মধ্যে সীমিত থাকে; কিন্তু বৈষম্য অনেক গভীর ও বহুমাত্রিক। প্রবেশাধিকার, মালিকানা, সুযোগ, কণ্ঠস্বর ও মর্যাদা ইত্যাদিসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে বৈষম্য রয়েছে।

আয়বৈষম্যের সূচক গিনি সহগ ০.৪৯ অতিক্রম করেছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম উচ্চ। এই সংখ্যা প্রতিফলিত করে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সম্পদবৈষম্য আরও গভীর; ভূমি, আবাসন ও আর্থিক সম্পদের মালিকানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী একটি শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য সমাজকে আরেকটি স্তরে ভাগ করে দিয়েছে। সরকারি স্কুল ও হাসপাতালের মান কমে যাওয়ায় সামর্থ্যবানেরা বেসরকারি সেবা গ্রহণ করছেন, দরিদ্ররা নিম্নমানের সেবায় আটকে পড়েছেন।

লিঙ্গ, জাতিগত ও ধর্মীয় বৈষম্য এখনো গভীর। নারী শ্রমিকেরা কম মজুরিতে ও অনিরাপদ কর্মপরিবেশে কাজ করছেন; আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকতায় ভুগছে। কণ্ঠস্বরের বৈষম্য সবচেয়ে সূক্ষ্ম, কিন্তু বিপজ্জনক। সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজ, শ্রমজীবী মানুষ ও তরুণদের কণ্ঠস্বর প্রায় অনুপস্থিত।

কাঠামোগত বৈষম্যের অর্থনৈতিক শিকড়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এমনভাবে গঠিত, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈষম্য পুনরুৎপাদন করে। রাজস্বনীতি, শিল্পনীতি, আর্থিক খাত, শ্রমবাজার—সব ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও দুর্নীতি বৈষম্যকে স্থায়ী করে তুলেছে।

রাজস্বকাঠামো বৈষম্যের অন্যতম প্রধান উৎস। রাজস্ব আয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসে পরোক্ষ কর থেকে, যা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর বেশি চাপ সৃষ্টি করে। অন্য দিকে উচ্চ আয়শ্রেণি নানা করছাড় পায়, রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক ফাঁকফোকর ব্যবহার করে কর এড়িয়ে যায়। ফলে রাজস্বব্যবস্থার ন্যায্যতা ভেঙে পড়ে।

শিল্পনীতি ও বিনিয়োগ কাঠামোতেও একই প্রবণতা। রাষ্ট্র বড় পুঁজিপতি ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা, করছাড় ও ব্যাংকঋণ বরাদ্দ করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা সহজে ঋণ পান না। খেলাপি ঋণ, ব্যাংক লুট, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ধনীদের সম্পদ সুরক্ষিত করেছে, সাধারণ আমানতকারীর আস্থা নষ্ট করেছে। ব্যাংক খাত কার্যত নীতিনির্ধারক ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে শিক্ষা ও শ্রমবাজারের দুর্বলতা দরিদ্রদের পিছিয়ে রেখেছে। মানসম্মত শিক্ষার অভাবে তাঁরা দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন না; শ্রমবাজারে তাঁদের মূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। এই বৈষম্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত।

কাঠামোগত বৈষম্যের রাজনৈতিক শিকড়

> গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অকস্মাৎ দুর্নীতি ও ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বৈষম্যের গতি ত্বরান্বিত করেছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের পেছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক বৈষম্য ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ ও সম্পদের বণ্টন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে, যার ফলে অর্থনীতি হয়ে উঠেছে একচেটিয়া ও অস্বচ্ছ। দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও স্বজনপ্রীতি রাজনৈতিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। বাজেট বরাদ্দ, সরকারি ক্রয়, ব্যাংকঋণ বিতরণ, এমনকি সরকারি চাকরিতেও রাজনৈতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। ফলে সম্পদ বণ্টনের ন্যায্যতা বিনষ্ট হচ্ছে এবং একটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা এই বৈষম্যকে স্থায়ী করে তুলেছে। সংসদ, স্থানীয় সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো কার্যকর নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা ক্ষমতাকেন্দ্রের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করতে পারেনি।

এর ফলে দুর্নীতি ও শাসনব্যর্থতা বৈষম্যের কাঠামোগত ইঞ্জিনে পরিণত হয়েছে। সরকারি চুক্তি, বড় প্রকল্প, ব্যাংকঋণ ও ব্যবসায়িক লাইসেন্স প্রায়ই রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে বণ্টিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বাজার প্রতিযোগিতা ভেঙে যায়, নতুন উদ্যোক্তাদের সুযোগ কমে যায় এবং সম্পদ একটি শ্রেণির হাতে জমা হয়।

এ ছাড়া রাষ্ট্রের দলীয়করণ ও নাগরিক সমাজের সংকোচন বৈষম্যের রাজনৈতিক শিকড়কে আরও গভীরে নিয়ে গেছে। প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা ও গণমাধ্যম দলীয় প্রভাবাধীন হয়ে পড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ভেঙে গেছে। নাগরিক সমাজ, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে নীরব করে রাখা হয়েছে, ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিজেদের অধিকার রক্ষার কোনো শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম পায় না।

কুজনেটস কার্ভের মিথ ভাঙা

অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেটস ১৯৫৫ সালে তাঁর বিখ্যাত তত্ত্বে বলেছিলেন, উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈষম্য বাড়ে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন শিক্ষা, শিল্পায়ন ও সামাজিক সুযোগ বাড়ে, তখন বৈষম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যায়। এ ধারণা অর্থনীতির পাঠ্যবইয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত ছিল, অনেক উন্নয়নশীল দেশ ভেবেছিল যে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কিছুটা বৈষম্য 'স্বাভাবিক'।

কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা এই তত্ত্ব স্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছে। গত দুই দশকে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ধারাবাহিক ও দৃঢ়, প্রতিবছর ৬ থেকে ৭ শতাংশ; কিন্তু এই প্রবৃদ্ধি জনগণের বৃহত্তর অংশে সমানভাবে পৌঁছায়নি। ফলে সার্বিক বৈষম্য কমেনি, বরং বেড়েছে।

কিন্তু ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া দেখিয়েছে, উন্নয়নের সঙ্গে বৈষম্য অনিবার্য নয়। ভিয়েতনাম ১৯৯০-এর দশকে বাজার সংস্কারের সমান্তরালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ করে। এর ফলে গ্রামীণ শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণি উন্নয়নের মূল অংশীদার হয়ে ওঠে এবং বৈষম্য নিয়ন্ত্রিত থাকে। মালয়েশিয়া ১৯৭০-এর দশকে 'নিউ ইকোনমিক পলিসি' গ্রহণ করে, যার লক্ষ্য ছিল জাতিগত বৈষম্য হ্রাস করা, শিক্ষা ও পুঁজির মালিকানায় বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা।

এই উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে বৈষম্য 'অপরিহার্য উন্নয়ন পর্ব নয়', বরং নীতিনির্ভর সিদ্ধান্তের ফল।

বৈষম্য কমাতে কী করা উচিত

বৈষম্য কমাতে শুধু অর্থনৈতিক সংস্কার নয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন। প্রথমত, প্রগতিশীল কর সংস্কার অপরিহার্য। আয়কর, সম্পত্তি কর ও উত্তরাধিকার করের আওতা বাড়াতে হবে; কর ফাঁকি রোধে ডিজিটাল ট্র্যাকিং-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। রাজস্বনীতি এমনভাবে সাজাতে হবে, যেন তা জনগণের স্বার্থে কাজ করে, ধনিক শ্রেণির স্বার্থে নয়।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও সর্বজনীন করতে হবে। উপকারভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, দুর্নীতি ও শাসনব্যর্থতা নিয়ন্ত্রণ এখন সবচেয়ে জরুরি। গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অকস্মাৎ দুর্নীতি ও ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বৈষম্যের গতি ত্বরান্বিত করেছে। সরকারি ক্রয়, ব্যাংকঋণ ও প্রকল্প বণ্টনে স্বজনপ্রীতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করেছে। দুর্নীতিকে কেবল নৈতিক সমস্যা হিসেবে নয়, বৈষম্যের কাঠামোগত ইঞ্জিন হিসেবে দেখতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আর্থিক তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

চতুর্থত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম ও স্থানীয় সরকার—এসব প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়া ন্যায়বিচারভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। নীতি প্রণয়নে নাগরিক সমাজ, তরুণ প্রজন্ম, নারী ও শ্রমজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। গণতান্ত্রিক কাঠামো পুনর্গঠন করতে হবে, যেন ক্ষমতার কেন্দ্র জনগণের কাছে ফিরে আসে।

বিশ্বস্ততার দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগতম

BRAC BANK
আস্থা অবিচল

- সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং
- দেশজুড়ে নেটওয়ার্ক
- অভিজ্ঞ ও স্বতন্ত্র পরিচালনা পর্ষদ
- সেরা ডিজিটাল সার্ভিস

ব্যাংকিং হোক
দেশসেরা
ব্যাংকের সাথে

16221

আলু, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও কৃষকের দীর্ঘশ্বাস

মোশাহিদা সুলতানা

সহযোগী অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০ টাকা কেজির আলু যখন শহরে এসে ভোক্তাদের প্লেটে ২০০ টাকার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয়, তখন বোঝা যায় এক দেশে দুই অর্থনীতি। তাই একদিকে ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করছেন কৃষক, অন্যদিকে ক্ষুদ্রঋণের বাজার আরও বিস্তৃত হচ্ছে। দাম না পেয়ে নিরুপায় কৃষক রাস্তায় আলু-পেঁয়াজ ফেলে প্রতিবাদ করলেও তাঁদের কথা কেউ শুনছে না। অন্যদিকে খাদ্য সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা বলছেন শক্তিশালী বিতরণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কেন?

ভোক্তা যে দামে কেনে, তার মধ্যে কৃষকের ভাগ দিন দিন কমছে। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য ব্যবহার করে একটি গবেষণায় (মাবরুর মাহমুদ, ২০২৪ দ্য বিলিয়নিয়ার ফার্মার) দেখা গেছে, ১৯৮৩ সালে একজন কৃষক ধান উৎপাদন করে যেখানে ভোক্তামূল্যের প্রায় ৭২ শতাংশ পেতেন, সেখানে ২০১৮ সালে একজন কৃষক ৫০ শতাংশ পান। অর্থাৎ ৪০ বছরে বাজারমূল্য নির্ধারণে কৃষকের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমেছে।

আজকের পৃথিবীতে ফসলের মূল্য বাজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছে সরকার। যেন উৎপাদন বাড়লেই হবে, দেশের ২৩ শতাংশ কৃষকের সন্তানেরা যদি প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পার হতে না পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কৃষক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করলে সমস্যা নেই। সারা দেশে ক্যানসারে আক্রান্তদের ৬৪ শতাংশ কৃষক হলে ও বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেও সমস্যা নেই।

বাংলাদেশে সার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি

কৃষি সংস্কার নিয়ে টাস্কফোর্সের রিপোর্টের প্রথম পাতায় দেখা যায় বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, নেপাল, পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশে সার ব্যবহার সর্বোচ্চ। সেই সঙ্গে ২০১০-এর দশকজুড়ে কৃষির প্রবৃদ্ধিও বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই প্রবৃদ্ধির কথা বলে গর্ব করা যায়, কিন্তু সঙ্গে সার ও কীটনাশকের কারণে কৃষকের ক্যানসারের কথাটা বলা যায় না। উন্নয়নের এ এক অপূর্ব প্রদর্শনী।

টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে খেতমজুরের পরিবর্তে যন্ত্র ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর, হিমাগারের চার্জ কমানোর বদলে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার, সারের কৃত্রিম সংকট রোধ না করে ভর্তুকি কমানোর এবং কৃষকের ঋণ কমানোর বদলে ফিনটেক (ফাইন্যান্স প্রযুক্তি) ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষিমূল্য কমিশন গঠন করে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ বা মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রস্তাব নেই। সব সুপারিশেই কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বেসরকারি খাতের ব্যবসা বিস্তার, যেখানে সরকারের ভূমিকা সীমিত কেবল তাদের সুবিধা নিশ্চিত করা পর্যন্ত।

খাদ্য সম্মেলনে গিয়ে এই বলে বড়াই করে আসা যায়—কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকার ৭০ শতাংশ ভর্তুকি দিচ্ছে, কিন্তু বলা যাচ্ছে না এই ভর্তুকির অর্থ প্রকৃত কৃষকের কাছে যাচ্ছে না। যাচ্ছে একদল প্রভাবশালীর কাছে।

ভর্তুকি কাদের জন্য

বারবার প্রসঙ্গ আসে, কৃষিতে উৎপাদন খরচ বেশির কারণ নাকি খেতমজুরের মজুরি বেশি। তো, খেতমজুরের কি বাড়িতে বউ-বাচ্চা নেই? নাকি আশা করা হয়, সে হবে এক পরিবারহীন মুসাফির শ্রমিক? অথচ সার, যন্ত্র, বীজ, সেচ ও হিমাগারের খরচ কীভাবে কমানো যায়, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে নিশ্চয়ই যন্ত্র দরকার, কিন্তু ভর্তুকি যদি প্রভাবশালীদের মুনাফা নিশ্চিত করার উপায় হয়, তবে কৃষকের কাছে এই ভর্তুকি কেবল দীর্ঘশ্বাসের গল্প।

বাকি অংশ ৯ পৃষ্ঠায়

স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য : প্রদীপের নিচের অন্ধকার

খায়রুল ইসলাম
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কর্মরত জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ

ইশতিয়াক মান্নান
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কর্মরত জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ

স্বাস্থ্য খাতের বৈষম্য নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে হলো, নানা খাতের মধ্যে সে নিতান্তই ব্রাত্য এবং বৈষম্য এর স্তরে স্তরে। গত অর্ধশতকে বৈষম্য কেবলই বেড়েছে।

জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র—এ কথা আমাদের সংবিধানে লেখা আছে। অবশ্য এটা রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা নয়, আকাঙ্ক্ষা মাত্র। কিন্তু 'স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকার'—এ কথা বলে এ খাতের জন্য ৫ শতাংশের কম বাজেট বরাদ্দ করা কোনো কাজের কথা নয়।

গড় আয়ুর ধারাবাহিক বৃদ্ধির সূচকের দিকে তাকিয়ে 'আমরা স্বাস্থ্যে প্রভূত উন্নতি করেছি' বলার অর্থ নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করা। শুধু বেঁচে থাকাই কি মানুষের জীবন? কীভাবে বেঁচে আছি, রোগব্যাধির পেছনে কত খরচ করে বেঁচে আছি, সেসব না বুঝে বেঁচে থাকার দৈর্ঘ্য নিয়ে গর্ব করা জীবনের অতি সরলীকরণ।

জরিপে সংখ্যাপ্রীতি বেশি

আমাদের রাজনীতিবিদদের সংখ্যাপ্রীতি প্রবল। স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সূচকে ধারাবাহিক উন্নতি দেখতে এবং দেখাতে খুব পছন্দ করেন। বাস্তব পরিস্থিতি যা-ই হোক, পরিসংখ্যানে মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ইত্যাদির সংখ্যা যত কম দেখা যাবে, তাঁরা তত খুশি হবেন। উল্টোভাবে, স্বাস্থ্যসেবাগ্রহীতার সংখ্যা যত বড় হবে, তাঁদের আনন্দ তত বাড়বে। আর যাঁরা মন্ত্রীদের তুষ্টি বাড়াতে চান, তাঁরা বড় বড় সংখ্যা উপস্থাপনের চেষ্টায় থাকেন। একটি জাতীয় জরিপে তুষ্টিমূলক সংখ্যা পাওয়া যায়নি বলে সেটির প্রকাশ দুই বছর আটকে রাখা হয়েছিল।

সংখ্যাপ্রীতির কারণে একধরনের মরীচিকা তৈরি হয়। কারণ, সংখ্যাগুলো সাধারণত 'গড়' হিসাব। গড় হিসাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার চিত্র থাকে না। সংখ্যার প্রবণতা হলো, সে স্ফীতির গল্প বলে, কিন্তু মানের অবনতির গল্প বলে না। দরিদ্র মানুষ যে নিম্নমানের সেবা বেশি দামে কিনছে, এই গল্প সংখ্যা কখনো বলে না।

গর্ভকালীন সেবা মানসম্পন্ন নয়

প্রদীপের নিচের অন্ধকার দেখতে আমাদের ভালো লাগে না, তাই আমরা কাকের মতো চোখ বন্ধ করে রাখতে ভালোবাসি। যেমন ৮৮ শতাংশ প্রসূতি গর্ভকালীন সেবা নেন, কিন্তু গরিবদের মাত্র ৮ শতাংশ পূর্ণাঙ্গ ও মানসম্পন্ন গর্ভকালীন সেবা পান। আমরা ৮৮ নিয়ে নৃত্য করি, কিন্তু ৮-এর কথা বলি না। এভাবে বড় বড় সংখ্যার কথা বলতে বলতে সত্যটা ভুলে যাই। সংখ্যা নিয়ে কারসাজি তথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পেশাগত নৈতিকতার অভাবও বৈষম্য অব্যাহত থাকার পেছনে বড় ভূমিকা পালন করে।

> পরিসংখ্যান বলে, শহুরে মানুষের স্বাস্থ্য গ্রামের মানুষের চেয়ে ভালো। কিন্তু এখানেও সেই গড়-শুভংকরের ফাঁকি।

স্বাস্থ্য খাতের পরিসংখ্যান ভেঙে ভেঙে দেখলেও সবখানে বৈষম্যের চিত্র মেলে। বলা হয়, কাউকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন নয়। কিন্তু কারা পেছনে পড়ে আছে? যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত নয়। কারা স্বাস্থ্যসেবা কম পেয়েছে? যে দরিদ্রতর। মৃত্যু কাদের মধ্যে বেশি? যারা শহর থেকে যত দূরে থাকে। কারা অপুষ্টিতে বেশি ভোগে? যারা মেয়ে হয়ে জন্মেছে। কারা নিয়মিত ডাক্তার দেখাতে পারে না? যারা পাহাড়ে থাকে, চর-হাওর এলাকায় থাকে।

তাহলে কি শহরে চলে এলেই স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে? দূর হয়ে যাবে বৈষম্য? পরিসংখ্যান বলে, শহুরে মানুষের স্বাস্থ্য গ্রামের মানুষের চেয়ে ভালো। কিন্তু এখানেও সেই গড়-শুভংকরের ফাঁকি। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শহুরে মানুষ নিম্নমানের আবাসনে ও বস্তিতে থাকেন। তাঁদের স্বাস্থ্য কিন্তু তাঁদের ছেড়ে আসা ভাইবোনদের চেয়ে খারাপ। তাঁরা নিশ্বাস নেন কার্বন ও সিসাসমৃদ্ধ বাতাসে, মলত্যাগ করে প্রয়োজনীয় পানি পান না, সাবান দিয়ে হাত ধুতে পারেন না, ভোগেন যক্ষ্মায়, নিউমোনিয়ায়, চর্মরোগে। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো অভিজাত হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ পান, কিন্তু অসুস্থ হলে সেই হাসপাতালের চিকিৎসা পাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। অথচ স্বাস্থ্যসেবা সর্বজনীন হওয়ার কথা।

সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাঠামো ও কাজের পদ্ধতি সাজানো হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীকে মাথায় রেখে। বর্তমানে জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭০ শতাংশের বয়স ৩০ বছরের নিচে। বয়ঃসন্ধি ও তারুণ্যের শুরুতে ছেলেমেয়েদের শরীর ও মনের বিশেষ সমস্যাবলি মোকাবিলার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা কি আমাদের আছে? সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিশাল অংশ যেন স্বাস্থ্যসেবা-কাঠামোর বাইরে রয়ে গেছে। এর পরিণতি বোঝার মতো দূরদৃষ্টি আমাদের নেই। কারণ, আমরা স্বাস্থ্য খাতকে চিকিৎসা খাত বানিয়ে ফেলেছি।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা, মান নিয়ন্ত্রণ করা, যেখানে প্রয়োজন লাগাম টেনে ধরা। কিন্তু এসবের অভাবে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। আর্থিক সক্ষমতা, ক্ষেত্রবিশেষে লাইন-ঘাট করতে পারা হয়ে পড়েছে ভালো স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার প্রধান উপায়। স্বাস্থ্যসেবা ক্রেতাদের দর-কষাকষির সুযোগ নেই; সরকার তাদের পক্ষে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে না; নেই কার্যকর স্বাস্থ্যবিমার ব্যবস্থা।

মৌলিক পরিবর্তন দরকার

স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য দূর করতে হলে নীতিনির্ধারক ও সরকারের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা মৌলিক পরিবর্তন দরকার, ইংরেজিতে যাকে প্যারাডাইম শিফট বলা হয়। এই পরিবর্তনটা হতে হবে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের আদর্শিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে। অর্ধশতকে আমাদের সব সরকার নিজেই স্বাস্থ্যসেবা দিতে চায় এবং এ পর্যন্ত এ কাজে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সরকারকে ভাবতে হবে যে তার কাজ সেবা প্রদান নয়, তার কাজ প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান দিয়ে এবং স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন বজায় রেখে জনগোষ্ঠীর সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ। সরকার নিজে করুক কিংবা লাভ বা অলাভজনক বেসরকারি খাত দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দিক, সাফল্যের মাপকাঠি হতে হবে কতটুকু বা কী বিনিয়োগ করলাম সেই হিসাবে নয়, জনগণের প্রাপ্তি কী হলো সেই হিসাবে।

আমরা হাততালিটা সময়ের একটু আগেই নিয়ে ফেলতে চাই। কতগুলো হাসপাতাল হলো এটা বলা রাজনৈতিক সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এটুকুতেই হাততালি দিয়ে ফেললে হবে না, কতজন সেই হাসপাতাল থেকে সেবা নিলেন সেখানেও হাততালি দেওয়া যাবে না, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সবাই সংখ্যায়, সময়মতো ও পূর্ণ গুণগত মানে প্রয়োজনমাফিক সেই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা পেয়েছেন কি না, পেয়ে খুশি হয়েছেন কি না, সেই পর্যন্ত জবাবদিহি নিয়ে হাততালি আশা করা যেতে পারে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য খাতে সরকারকে ইনপুট ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত না থেকে আউটকাম ব্যবস্থাপনায় নজর এবং দক্ষ হতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের বৈষম্য নিরসনী সাফল্য নামের বৃক্ষের পরিচয়টা ফলে হোক এবং অবশ্যই তা মাকাল ফলে নয়।

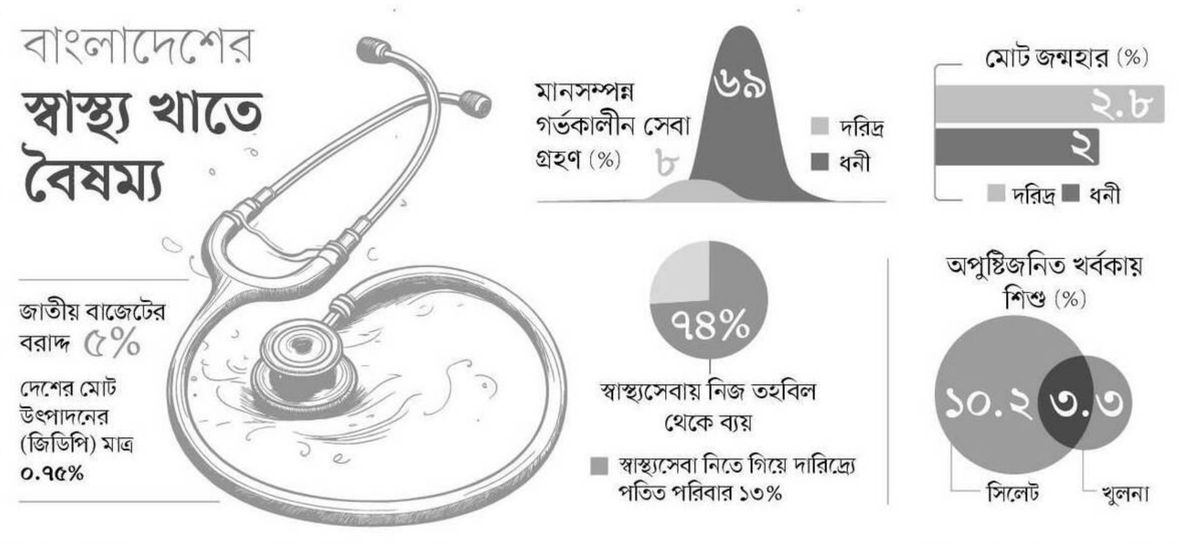

রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা। কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি : প্রথম আলো

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা একটা অধরা আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে। কারও অসুখ হলে তাঁর চিকিৎসায় যদি সর্বমোট ১০০ টাকা খরচ হয়, তার ৭৪ টাকাই তাঁকে নগদ গুনতে হয়। যে ২৬ টাকা রাষ্ট্র খরচ করে, তার একটা অংশও কিন্তু তাঁরই দেওয়া প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর। বহু পরিবার চিকিৎসার খরচ জোগাড় করে ধার করে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে, শিক্ষার মতো অন্য প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে। প্রায় ১৩ শতাংশ পরিবার প্রতিবছর স্বাস্থ্যসেবার খরচ জোগান দিতে গিয়ে দারিদ্র্যে পতিত হয়। এই মানুষদের কিন্তু রাষ্ট্রের সুরক্ষা পাওয়ার কথা ছিল, তারা তা পায়নি। বিশ্বসভায় সই করে বাংলাদেশ কথা দিয়ে এসেছিল, পাবে। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ কথা রাখেনি।

বাতাসে কান পাতলে অবশ্য কিছুটা আশার ফিসফিসানি শোনা যায় : স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট ও পরামর্শগুলো ছাপা কাগজেই সীমাবদ্ধ নেই। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ও তাদের শীর্ষ পর্যায় থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সেগুলো জানা, বোঝা ও সমাধানের উপায় নিয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হচ্ছে। নিঃসন্দেহে ভালো খবর, আশার খবর। আমরা আশা করি, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য খাত নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা পরিষ্কার করে বলবে এবং ভুলে যাবে না। স্বাস্থ্য খাতের বৈষম্য দূর করতে আমলাতন্ত্র, মুনাফার আগ্রাসী লোভ, পেশাতন্ত্রের যে পরিমাণ বোঝা ঠেলে সরাতে হবে, আশা করি আগামীর ক্ষমতাসীন দলগুলো তাতে পিছপা হবে না।

*মতামত লেখকদের নিজস্ব, প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান নয়।

আলু, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও কৃষকের দীর্ঘশ্বাস

৮ পৃষ্ঠার পর

বিতরণ ব্যবস্থা দুর্বল

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শক্তিশালী বিতরণব্যবস্থা নিয়ে বড়াই করা যায়, উত্তরবঙ্গে খেতেই আড়াই হাজার কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়, তা বলা যায় না। আগে রাষ্ট্রায়ত্ত হিমাগার ছিল। সরকার সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করত। লোকসানের অজুহাত দিয়ে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন যখন প্রভাবশালীরা হিমাগারের মালিক হয়েছেন, তাঁরা হিমাগারে বিনিয়োগের কারণ দেখিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন, কিন্তু বিনিয়োগ করছেন অন্যত্র। হিমাগারের মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রেখেছেন লোকসান দেখিয়ে। এই যে রাষ্ট্রায়ত্ত হিমাগার বন্ধ করে বেসরকারি খাতে হিমাগারের জন্য ঋণ দিল, এখন কেন তারা লোকসানের অজুহাত দেখাচ্ছে? কেন আলুর ভরা মৌসুমে হিমাগারের ভাড়া বাড়িয়ে আলু কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য করছে?

কৃষিভিত্তিক শিল্প কৃষকের পণ্যের বাজার নিশ্চিত করে, কিন্তু ২০২০ সালে উত্তরবঙ্গের ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের মধ্যে ৬টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী সরকার আবার চালুর ঘোষণা দিলেও এক বছরে মাত্র দুটি চিনিকলের জন্য ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দও মেলেনি। লোকসানি অজুহাতে স্থানীয় চিনিকল বন্ধ রেখে সরকার বিদেশ থেকে র-সুগার আমদানি করে বেসরকারি রিফাইনারিকে দিচ্ছে, ফলে চিনির দাম দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ এসব রিফাইনারি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনলে কৃষক, ভোক্তা ও রাষ্ট্র—তিন পক্ষই লাভবান হতো।

অন্তর্বর্তী সরকার এস আলমের রিফাইনারিকে নিলামে তুলেছে। অথচ সরকার যদি এই রিফাইনারি কিনে নিজে পরিচালনা করত, তাহলে চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের লাভ হতো। অন্যদিকে ভোক্তারাও কম দামে চিনি কিনতে পারত। তা ছাড়া চিনিকলের বর্জ্য দিয়ে জৈব সার উৎপাদন করা যায়, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। চিনিকলের উপজাত মোলাসেস গবাদিপশুর চমৎকার খাদ্য। এসব বিবেচনা না করে উল্টো যখন ইকোনমিক জোনগুলোর কৃষিজমি পড়ে আছে, বিনিয়োগ আসছে না, তখন চিনিকলের জমি বিদেশি বিনিয়োগ আনার অজুহাতে ফেলে রাখা হয়েছে।

কঠিন ঋণ

ঋণের চাপে কৃষকেরা আত্মহত্যা করছেন অথচ তাঁদের জন্য কোনো গ্রেস পিরিয়ড নেই। ফলে তাঁরা এক ঋণ শোধে আরেক ঋণ নিতে বাধ্য হন। যেখানে ঋণের শর্ত শিথিল করার কথা, সেখানে এই ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের নামে ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস, ব্যুরো বাংলাদেশ, উদ্দীপনসহ বড় আকারের ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠান বা এনজিওগুলোতে দুজন করে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ দেওয়ার বিধান করতে যাচ্ছে।

স্বতন্ত্র পরিচালক হতে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ১০ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সমস্যার সমাধান না করে এর মাধ্যমে সরকার মূলত আমলাদের সুবিধা দেওয়ার পথ খুলবে। এতে কৃষকের বৈষম্য বাড়বে, সংকটও গভীর হবে। অন্তর্বর্তী সরকারও সেই পুরোনো পথেই চলছে। নিজ গোত্রকে সুবিধা দেওয়াই যেহেতু এখানে মুখ্য, তাই মনোযোগ এসব দিকেই।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭২ সালের ৩০ এপ্রিল শিবপুরে ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলনে লাখো কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবকে বলেছিলেন, 'যদি জাতির জনক হতে চাও, তাহলে তোমার দালানের বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসো তোমার ছেলেদের সঙ্গে, যা জোটে খাও, যেভাবে ছেলেমেয়েরা থাকে, সেভাবে থাকো। তা ছাড়া জাতির জনক হওয়া চলবে না।' (পৃষ্ঠা ৩১৫, মওলানা ভাসানীর কৃষক সমিতি)

শুনলে মনে হবে, ভাসানী আক্ষরিক অর্থে শেখ মুজিবকে তাঁর দালান ছেড়ে চলে আসতে বলছেন। আসলে এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, তিনি আহ্বান করছেন শহরের বুর্জোয়া রাজনীতি ছেড়ে কৃষকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজনীতি করতে। মেহনতি মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে।

আবু সাঈদ কৃষকের সন্তান

২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে প্রথম যে ছয়জন শহীদ হয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে যে অকুতোভয় ছেলেটি পুলিশকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর বুকে গুলি করতে, সেই আবু সাঈদ কৃষক পরিবারের। কোটা আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হওয়ার সন্ধিক্ষণে এই আন্দোলনের নামকরণ হয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। আবারও বৈষম্য থেকে মুক্তির যে সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা, তারই প্রতিফলন দেখা যায় এই নামকরণের মধ্য দিয়ে। মেহনতি জনগণ বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বৈষম্য নিরসনের আকাঙ্ক্ষা লালন করে আসছে।

> ৫৩ বছরে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি বলে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর মানুষ আবার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল কৃষি খাত সংস্কারেরও।

৫৩ বছরে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি বলে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর মানুষ আবার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল কৃষি খাত সংস্কারেরও। কিন্তু দেখা গেল, যাঁরা দায়িত্ব নেন, তাঁরা কৃষকের জগৎ থেকে বহুদূরে বাস করেন। যন্ত্র, সার, বীজ, ঋণ নিয়ে ব্যবসার দিকেই তাঁদের মনোযোগ বেশি। উদ্যোক্তা-প্রেমিক, প্রাইভেট সেক্টর-প্রেমিক, এনজিও-প্রেমিক তারকা নীতিনির্ধারক ও উপদেষ্টাদের কাছে জনগণের অর্থ শুধু নিজ গোত্রের মুনাফা বানানোর মাধ্যম। এর বিনিময়ে জনগণ শোনেন কিছু মিষ্টি মিষ্টি প্রতিশ্রুতি। কৃষকের জন্য সেখানে সত্যিই কিছু থাকে না।

আজকের নায়ক কালকের খলনায়ক

১৯ পৃষ্ঠার পর

কাঠামো। *উপধারা একাত্তর*-এ মঈদুল হাসান তুলে আনলেন মানিক মিয়ার ভূমিকা, যিনি ছয় দফা বাস্তবায়নের শুরুতে 'গো স্লো' কৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন। করাচিতে হৃদ্‌রোগে তাঁর হঠাৎ মৃত্যু তৈরি করেছিল এক বড় শূন্যতা, তরুণ র‍্যাডিক্যাল নেতারা যা দ্রুত পূরণ করেছিলেন। তাঁরা আপস ছাড়াই ছয় দফার পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি তোলেন। এর পরের ইতিহাস একাত্তরের গল্প, 'কোনো আপস নয়' মনোভাব যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করে। এই ইতিহাস জটিল। তাই তার গভীরে যাওয়ার ধৈর্য থাকা দরকার।

মুক্তিযুদ্ধের আরেক ধারার ইতিহাস আছে, বামপন্থী লড়াইয়ের কাহিনি, যেমন হায়দার আনোয়ার খান জুনোর *একাত্তরের রণাঙ্গন : শিবপুর* (২০১১)। ইন্দিরা সরকারের মধ্যে তখন একটা ভয় কাজ করছিল, মুক্তিবাহিনীর ভেতরে বামপন্থীরা হয়তো পশ্চিমবঙ্গের নকশালদের সঙ্গে হাত মেলাবে। তাই তাদের প্রতি সন্দেহ ছিল প্রবল। অনেক সময় বামপন্থীরা একদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে সতর্ক থেকেছে ভারতের সেনাবাহিনীর চোখরাঙানির সামনে। একাত্তরকে বুঝতে গেলে এই অস্থির বামপন্থী অভিজ্ঞতাগুলো নিয়েও খোলামেলা আলোচনা দরকার।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে ভাবা যাক। মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ তারিক আলী তাঁর *পাকিস্তান : মিলিটারি রুলস অর পিপলস পাওয়ার* (১৯৭০) বইয়ে লিখেছিলেন, আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের শেষ ধাপ শুরু হয়েছিল রাওয়ালপিন্ডি থেকে। কিন্তু তারিক আলী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লিখছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান তাঁর অদেখা থেকে গিয়েছিল। শামসুর রাহমানের কবিতার 'গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের/ জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট' তারিক আলীর চোখে পড়েনি। তবু তারিক আলীর বই বাতিল না করে বরং তাঁর স্মৃতিচিত্রকে আমাদের বয়ানের পাশে রেখে পড়তে পারি। ইতিহাস সব সময়ই বহুপক্ষীয়, একরঙা মোটেই নয়।

১৯৭১ সাল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। সেই রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি হচ্ছে মুক্তচিন্তার চর্চা। আহমদ ছফা *ভোরের কাগজ*-এ একবার লিখেছিলেন, 'একাত্তর মহাসিন্ধুর কল্লোল'। ইতিহাস সেই মহাসমুদ্রেরই মতো, যেখানে আছে বহু কণ্ঠ আর স্রোত। একাত্তর, এমনকি ইতিহাসের যেকোনো প্রসঙ্গ নিয়ে খোলামেলা ও গভীরতর গবেষণার জন্য প্রয়োজন এমন এক গ্রন্থাগার, যেখানে বইগুলো একে অন্যের সঙ্গে বিতর্ক, সংলাপ, দ্বিধা ও সৌন্দর্যে ভরপুর হবে। আর সেটা হবে অগণিত, বিশৃঙ্খল, কিন্তু জীবন্ত।

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH
১ম পর্ব
নতুন বই : পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

০১. ওয়াসি আহমেদ
কার্পাসমহল (উপন্যাস) [মুদ্রিত মূল্য: ৬০০]
০২. মামুন হুসাইন
বিষণ্ন হওয়ার ফিল্ড গাইড (উপন্যাস)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
০৩. রেজাউল করিম
• মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানপতন-১ (ইতিহাস)
মুদ্রিত মূল্য: ১২০০
• মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানপতন-২ (ইতিহাস)
মুদ্রিত মূল্য: ১০০০
০৪. নূরুল কবীর
দ্বিরালাপ : চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও পূর্বাপর রাজনীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলাপচারিতা [মুদ্রিত মূল্য: ৫০০]
০৫. আফসানা বেগম
জাম্প অ্যান্ড দ্য আদার স্টোরিজ (অনুবাদ গল্প)
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০
০৬. অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
কাউন্সেলিং টেবিলের গল্প : সঙ+সার=সংসার (পরিবার কাউন্সেলিং) [মুদ্রিত মূল্য: ৬৫০]
০৭. জ্যোতির্ময় সেন
পৌরাণিক নদী অভিধান (গবেষণা) [মুদ্রিত মূল্য: ৭০০]
০৮. কে এম মহিউদ্দিন
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ: কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও চর্চা (শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি)
মুদ্রিত মূল্য: ১০০০
০৯. সরদার ফজলুল করিম
অতিক্রান্ত সময় (দিনলিপি) [মুদ্রিত মূল্য: ১২০০]
১০. আনন্দ অন্তঃলীন
নৈরাজ্যবাদী নৃবিজ্ঞান: বিকল্প সম্ভাবনা (নৃবিজ্ঞান)
মুদ্রিত মূল্য: ৬৫০
১১. সালেক খোকন
মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী ঘটনামালা (মুক্তিযুদ্ধ)
মুদ্রিত মূল্য: ৬০০
১২. মাসুদ খোন্দকার
ইসলাম ও কূটনীতি (আন্তর্জাতিক রাজনীতি)
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০
১৩. মো. সাইফুজ্ জামান
নিম্নবর্গ ও বাংলাদেশের নাটক ১৯৭১—২০০০ (নাটক) [মুদ্রিত মূল্য: ৬০০]
১৪. নিলয় নন্দী
কারগিয়েল সাহেবের কবর (কিশোরগল্প)
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০
১৫. দীপু মাহমুদ
রহস্যের ঘনঘটা (কিশোর গোয়েন্দা উপন্যাস)
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০
১৬. অনুবাদ ও সম্পাদনা দিলওয়ার হাসান
জাপানের রূপকথা [মুদ্রিত মূল্য: ৩০০]
১৭. মাইনুল এইচ সিরাজী
জিনিয়াস লিনিয়াস (কিশোর থ্রিলার) [মুদ্রিত মূল্য: ৩৫০]
১৮. রবিউল কমল
জেলিয়েন (সায়েন্স ফিকশন) [মুদ্রিত মূল্য: ২৫০]
১৯. ইশতিয়াক হাসান
অদ্ভুত ৫০: বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য এক পৃথিবীতে স্বাগত (অজানা কাহিনি)
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০
২০. সৈয়দ জাকির হোসেন
সভ্যতার অন্তরালে: ইতিহাস, সামষ্টিক মনস্তত্ত্ব ও সভ্যতার বিভ্রম (মনোবিজ্ঞান)
[মুদ্রিত মূল্য: ১০০০]
২১. রাহনুমা দিশা
রসায়নের গালগপ্পো (বিজ্ঞান) [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]
২২. মার্টিন উইডমার্ক
সনকার গোয়েন্দাবাহিনী (সুইডিশ উপন্যাস)
রূপান্তর জাহীদ রেজা নূর [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]
২৩. শারমিনুর নাহার
ইলা মিত্র (জীবনীগ্রন্থ) [মুদ্রিত মূল্য: ৩০০]
২৪. আয়শা সিদ্দিকা
নিকোলা টেসলা (জীবনীগ্রন্থ) [মুদ্রিত মূল্য: ৩০০]
২৫. মুহিত হাসান
সুকুমার রায় (জীবনীগ্রন্থ) [মুদ্রিত মূল্য: ৩০০]
২৬. মুহিত হাসান
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (জীবনীগ্রন্থ)
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০

পুরানো বইয়ের ন্যাপথলিন

• সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
উন্নতি, উত্থান ও অভ্যুত্থান (রাজনীতি)
মুদ্রিত মূল্য : ৫০০
• সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পাদিত)
শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [মুদ্রিত মূল্য : ৭০০]
• যতীন সরকার
সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রত্যাশা
মুদ্রিত মূল্য : ৪০০
• নিকোস কাজানজাকিস
অনুবাদ ও ভূমিকা খালিকুজ্জামান ইলিয়াস
জোরবা দ্য গ্রিক [মুদ্রিত মূল্য : ৫০০]
• কাজী জাহেদ ইকবাল
বাংলাদেশের সংবিধান : ইতিহাসের পুনর্পাঠ (আইন ও সংবিধান) [মুদ্রিত মূল্য : ৬০০]
• বেগম আকতার কামাল
বাসনা: মননে স্বরায়নে (মনোবিশ্লেষণ)
মুদ্রিত মূল্য : ৩০০
• খোরশেদ আলম
লোভ : অস্তিত্বের অন্তরালে (মনোবিশ্লেষণ)
মুদ্রিত মূল্য : ৩০০
• তারানা নূপুর
যৌনতা : ইতিহাস ও প্রতিভাস (মনোবিশ্লেষণ)
মুদ্রিত মূল্য : ৩০০
• মাসুদ পারভেজ
মৃত্যু : সাহিত্যে নির্জ্ঞানে (মনোবিশ্লেষণ)
মুদ্রিত মূল্য : ৩০০
• অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
কাউন্সেলিং টেবিলের গল্প : অবচেতন মনের কথা (মনস্তত্ত্ব) [মুদ্রিত মূল্য : ৬০০]
• সৈয়দ জাকির হোসেন
বোধগম্যতার গহিনে : জ্ঞান প্রক্রিয়া, আচরণ ও জীবনবোধ (মনোবিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব) [মুদ্রিত মূল্য: ১০০০]
• থমাস হাইল্যান্ড এরিকসেন ও ফিন সিভার্ট নিয়েলসেন
নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস
ভাষান্তর আনন্দ অন্তঃলীন
মুদ্রিত মূল্য : ৫০০
• আশানুর রহমান
লেনিন (উপন্যাস)
মুদ্রিত মূল্য : ৬০০

৩০% ছাড়!
বিজ্ঞাপনটির ছবি তুলে আমাদের WhatsApp করুন, কিংবা হটলাইনে কল করে বুঝে নিন ৩০% ছাড়!
WhatsApp/Hotline
01324 25 46 31
অনলাইন অর্ডার
kathaprokash.com
kathaprokash

বহুরূপী শিক্ষাবৈষম্যের বহুমাত্রিক আঘাত

মনজুর আহমদ

শিক্ষাবিদ ও ইমেরিটাস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের উৎস ছিল শিক্ষাবৈষম্যের অনেক ক্ষেত্রের মধ্যে একটি—শিক্ষার সমাপ্তিতে কর্মসংস্থানে বৈষম্য, যা কোটা আন্দোলন নামে পরিচিত। গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলো। রাষ্ট্র ও সমাজে রূপান্তরের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে, শিক্ষা রূপান্তরের উদ্যোগ এতে থাকবে—এ রকম আশ্বাস পাওয়া গেল অধ্যাপক ইউনূসের জাতির উদ্দেশে প্রথম গণভাষণে (২৫ আগস্ট ২০২৪)। কিন্তু প্রথমেই খটকা লাগল, যখন দেখা গেল রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে সংস্কারের পরামর্শ দেওয়ার জন্য ১১টি উচ্চমর্যাদার কমিশন গঠন করা হলো, কিন্তু শিক্ষার জন্য কোনো কমিশন গঠন করা হলো না।

শিক্ষার সুযোগ ও মানের বৈষম্য ঔপনিবেশিক কালেই শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের আধা ঔপনিবেশিক আমলেও শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্তত মৌলিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত রাষ্ট্রের দায়িত্বে সর্বজনীন সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে—এই প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই শিক্ষানীতি এখনো বলবৎ আছে। কিন্তু সব শিশুর জন্য গ্রহণযোগ্য মানসম্মত শিক্ষার অধিকার বা সুযোগ ২০২৫ সালেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং শিক্ষাব্যবস্থাই সমাজের বিদ্যমান বহুমাত্রিক বৈষম্যকে আরও পাকাপোক্ত করার ইন্ধন জোগাচ্ছে।

২

শিক্ষার সংকটের বর্ণনা হিসেবে বৈষম্য কথাটি বহুল আলোচিত। শিক্ষার নানা বিদ্যমান সমস্যা, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এর প্রতিক্রিয়া বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমস্যার প্রকৃতি বোঝা ও সমাধানের পথ খোঁজা সহজ হতে পারে। সে জন্য শিক্ষার বৈষম্যের প্রকাশ ও স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

যেকোনো শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি উপাদানে বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটে—শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তি বা অভিগম্যতা, শিক্ষার সংস্থান ও সেবার মান এবং শিক্ষা থেকে অর্জিত ফল। অভিগম্যতা সাধারণত শিক্ষার সংখ্যাগত বিস্তার দিয়ে বোঝানো হয়। এটাকেই শিক্ষার অগ্রগতির বয়ান হিসেবে সব ক্ষমতাসীন সরকার প্রচার করে। কিন্তু এখানে রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। প্রথমত, গড় ভর্তির হার থেকে সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর চিত্র পাওয়া যায় না। দারিদ্র্য অভিগম্যতায় এক বড় বাধা; কারণ, সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও আসলে প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়া বা কোচিং অপরিহার্য মনে করা হয়। ২০২২ সালে শিশুশ্রম জরিপে দেখা যায়, ৫-১৭ বছরের শিশুদের ৪ দশমিক ৪ শতাংশ বা প্রায় ১৮ লাখ শিশুশ্রমে নিযুক্ত ছিল, যা তাদের পড়ালেখা ব্যাহত করেছে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত ছিল, যা তাদের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক।

স্কুলিং উইদাউট লার্নিং অর্থাৎ বিদ্যালয়ে গিয়েও কিছু না শেখা আমাদের অনেক বিদ্যালয়ের এক প্রকৃষ্ট বর্ণনায় দাঁড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া যে শিশুরা প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়, তাদের অন্তত ১৫ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ঝরে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করার পরেও এই অবস্থা বিদ্যমান।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে সর্বজনীন করার দায়িত্ব সরকার এখনো নেয়নি। এই স্তরের নির্দিষ্ট বয়সের শিশুদের দুই-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ে নাম লেখায়; কিন্তু তাদের এক-তৃতীয়াংশ ঝরে পড়ে। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে (১১ থেকে ১৫ বছর) শিশুদের অর্ধেকও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে না। শিক্ষার গুণগত মানের বৈষম্যের দৃশ্যমান প্রকাশ বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য শিক্ষকের উপস্থিতি এবং শিক্ষাসামগ্রী ও উপকরণের সংস্থানে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। সরকারি বয়ানে অবকাঠামোর সংস্থান আর সমস্যা নয় বলে বর্ণিত হয়। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণিকক্ষ, সীমানাদেয়াল ও খেলার মাঠবিহীন অসংখ্য স্কুল, শিক্ষকের অভাবে দুই শ্রেণির একসঙ্গে পাঠদান বা একই শ্রেণিতে ৬০ থেকে ১০০ শিক্ষার্থী, লাইব্রেরি বা ল্যাবরেটরির অভাব—এসব এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখায়। সমাজের বিত্তবান ও সুযোগভোগী অংশের সদস্যরা শহরের বস্তি এলাকার ও প্রত্যন্ত গ্রামের এসব বিদ্যালয় এড়িয়ে চলেন।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পরিবেশ এখনো শহরের বিদ্যালয় থেকে পিছিয়ে আছে। ছবি : প্রথম আলো

৩

শিক্ষার মান ও পরিমাণগত সংস্থান আলাদা করে দেখা যায় না। স্কুলে হাজিরা দিয়ে শিক্ষার্থী যদি কিছু না শেখে, তবে এই অভিগম্যতা অর্থহীন। কিন্তু বাস্তবে সেই চিত্রই দেখা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনায় বলা হয়, বাংলাদেশে ১০ থেকে ১৪ বছরের কিশোর-কিশোরীদের ৫১ শতাংশের বেশি একটি সাধারণ বাংলা অনুচ্ছেদ পড়তে পারে না। অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি কিশোর-কিশোরী ব্যবহারিক সাক্ষরতা অর্জন করেনি। সরকারের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর দক্ষতা যাচাই জরিপ থেকেও একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। যে অর্ধেক পড়তে ও লিখতে পারে না, তারাই তো সমাজের সুযোগবঞ্চিত, দরিদ্র ও হতভাগ্য অংশ।

> যে শিশুরা প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়, তাদের অন্তত ১৫ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ঝরে পড়ে।

কী কারণে এবং কীভাবে সুযোগবঞ্চিতরা বঞ্চনার শিকার হয়? যে পরিস্থিতি ও শর্তে শিক্ষাবৈষম্যের প্রকাশ ঘটে, সেগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়—অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যজনিত।

আগেই বলা হয়েছে, দারিদ্র্যের জন্য গ্রহণযোগ্য মানের শিক্ষায় অভিগম্যতা নিশ্চিত হয়নি। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক নিরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, ২৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ২০২২ সালে তা ছিল ১৯ শতাংশ। এদের সন্তানের শিক্ষার জন্য ভালো স্কুলের ফি দেওয়ার বা প্রাইভেট শিক্ষকের জন্য ব্যয়ের সামর্থ্য থাকার কথা নয়। দারিদ্র্যরেখার ওপরে থাকলেও যেকোনো সময় অন্তত ২০ শতাংশ পরিবারের একজন বড় অসুস্থতায় পড়লে বা প্রধান উপার্জনকারী বেকার হয়ে গেলে তারা দারিদ্র্যরেখার নিচে চলে যায়।

হাওর, চর, পাহাড়ি অঞ্চল, উপকূল—এসব এলাকার পরিস্থিতি প্রতিকূল। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এসব এলাকায় প্রবলতর। বাংলাদেশের অন্তত এক-চতুর্থাংশ লোক এসব এলাকায় বাস করে, যারা বিভিন্নভাবে শিক্ষাবৈষম্যে ভোগে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ক্ষেত্র হচ্ছে ভাষা, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক ভিন্নতা ইত্যাদি সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং এসব কারণে মূল জনগোষ্ঠীর বাইরে থাকা মানুষ। তাদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকলে তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যা কম হলেও গণনায় সংখ্যাটি মোটেই ছোট নয়।

ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যজনিত কারণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় বিশেষ সেবার ব্যবস্থা না থাকা। বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধীরা এই বৈষম্যের শিকার। এ ধরনের বৈষম্যের বড় এক ক্ষেত্র লিঙ্গপরিচয়জনিত। ট্রান্সজেন্ডার, অনির্দিষ্ট লিঙ্গ বা হিজড়া হিসেবে পরিচিতরা সামাজিক ও শিক্ষাগত বৈষম্যের শিকার। ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে এখন যুক্ত হয়েছে নতুন ধরনের বৈষম্য। ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ ও মান বৃদ্ধির হাতিয়ার বলে প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বিত্তবান ও বিশেষ মেধাবীরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে এগিয়ে যাচ্ছে তরুণদের বৃহত্তর অংশকে পেছনে ফেলে।

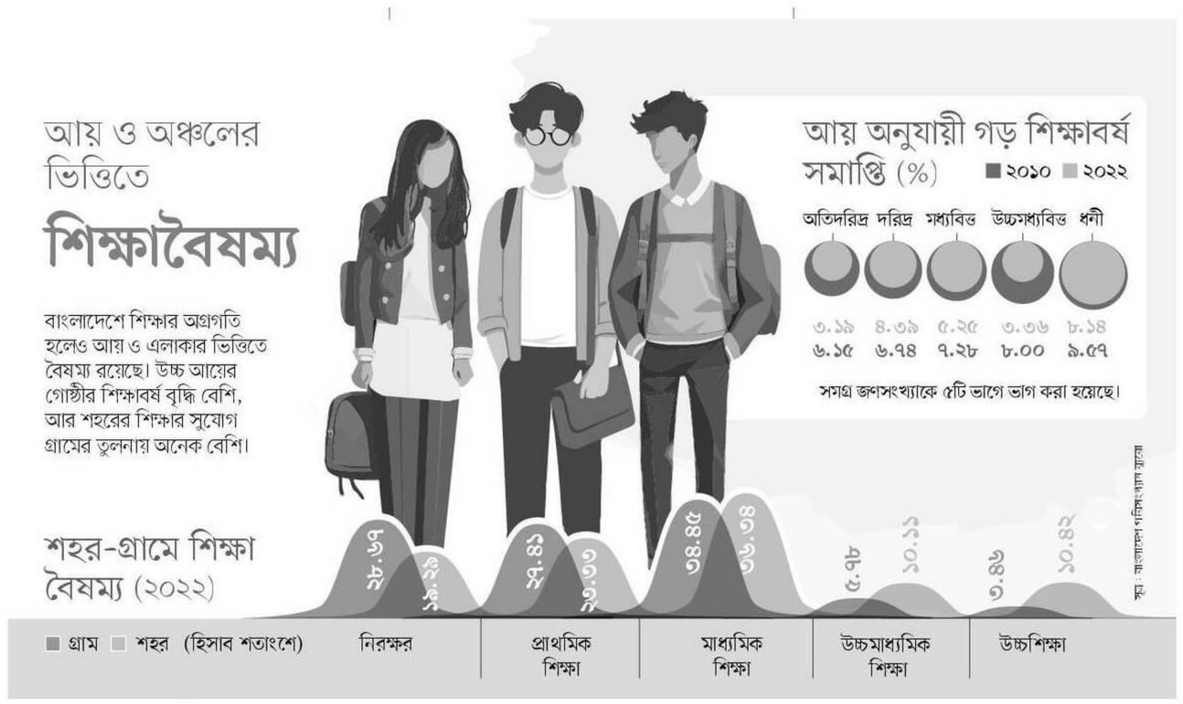

৪

শিক্ষার বৈষম্যের ধরন ও এর বহুমুখী প্রকাশ নতুন প্রজন্মের এক বড় অংশের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করছে এবং সমাজের সামষ্টিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত বেকার, হতাশাগ্রস্ত তরুণদের মাদকাসক্তি ও অপরাধে জড়িয়ে পড়া, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক চরমপন্থার প্রতি আকর্ষণ, মানসিক বৈকল্যের শিকার হওয়া—এসব শিক্ষাবৈষম্যের বিষাক্ত ফল।

সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে তরুণদের এক বড় অংশ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়ের সমাজ গঠনে অংশ নিতে পারছে না; দেশ ও সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। রাজনৈতিক শ্রেণি, ক্ষমতাবান আমলাতন্ত্র ও সুযোগভোগী ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধারেরা কি মৌলিক পরিবর্তনে আগ্রহী?

শিক্ষার ভবিষ্যৎবিষয়ক ইউনেসকোর আন্তর্জাতিক কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও সচেতন নাগরিককে সম্মিলিতভাবে এক লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালকদের শিক্ষার রূপান্তরের উদ্দেশ্যে একটি সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ করতে হবে। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান কি আংশিকভাবে হলেও সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে? নাকি আমাদের আরেক অভ্যুত্থানের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে?

*সতামত লেখকের নিজস্ব, প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান নয়।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য, বৈচিত্র্য ও বিপ্লব

সুমন রহমান

কথাসাহিত্যিক ও অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস

‘সাংস্কৃতিক বৈষম্য’ কোনো শব্দবন্ধ হিসেবে কতটা দরকারি, তা নির্ভর করে আপনি কীভাবে সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করছেন, তার ওপর। সংস্কৃতিকে আপনি যদি স্রেফ শিল্প, সাহিত্য, সংগীত—এ রকম কিছু কর্মকাণ্ডে আটকিয়ে ফেলেন, তখন হয়তো বৈষম্য জিনিসটার প্রায়োগিক মানে দাঁড়ায়। কিন্তু সংস্কৃতি যদি হয় গণমানুষের সাবজেক্টিভিটিকে আমূল বদলে দেওয়ার চর্চা, সেখানে ‘বৈষম্য’ প্রত্যয়টার অর্থ আলাদাভাবে বোধগম্য নয়। ওই জায়গায় সাংস্কৃতিক বৈষম্য জিনিসটাকে বুঝতে হবে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহাসিকভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমি দিয়ে।

সব মিলিয়েই আমি

আমরা যার যার কুঠুরির মধ্যে বাস করতে পছন্দ করি। এটাকে সাংস্কৃতিক কুঠুরি বলা যায়। আমার অভ্যাস, আমার প্রার্থনা, আমার গান, আমার আচার, আমার বিশ্বাস—এসব মিলিয়েই আমি। অন্য থেকে নিজেকে আলাদা করার মাধ্যমে আমি আমার সংস্কৃতিকে চিনতে ও চেনাতে পারি—দেরিদার ভাষায় যাকে বলে ‘ডিফার’ ও ‘ডেফার’ করা। আত্ম-আবিষ্কারের এই যে নিরন্তর পিচ্ছিল পথ, এই পথের পথিক না হয়ে উপায়ও নেই। সময় আমাকে বাধ্য করে। ঘটনা আমাকে ঠেলে দেয়। আমার মাঝে আমি এক অচেনা আমাকে আবিষ্কার করি। তাকে ভালোবেসে ফেলি। এই ভালোবাসা নিঃশর্ত নয়। এই ভালোবাসাকে অর্থপূর্ণ করার জন্য আমাকে একটা বর্গের অধীন যেতে হয়। একটা গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে আমি শনাক্ত করি। অপরাপর গোষ্ঠীর থেকে পৃথক একটা জায়গা খুঁজে নিতে হয়।

ফলে সংস্কৃতি, আন্তশ্রেণি প্রশ্নে প্রায় সব সময়ই বৈষম্যমূলক। বৈষম্য তৈরি হয়। কারণ, আমাদের অনেকগুলো বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিদিনের জীবনকে মোকাবিলা করতে হয়। এদের কোনো কোনোটাকে আমি আমার বর্গের বলে শনাক্ত করি। কোনো কোনোটাকে ‘অপর’ বলি। এদের মধ্যে লড়াই খুব চলে। ক্ষমতা ও সংস্কৃতি একে অপরকে পোক্ত করে।

কিন্তু কখনো এমন দিন আসে, যখন বিরাজমান সংস্কৃতিসমূহ তাদের অন্তর্গত বিভেদ ও বৈষম্য ভুলে যায়। রাজনীতি ও অর্থনীতি এই ক্যারিশমা ঘটায়। চব্বিশের জুলাই আন্দোলন যখন র‍্যাপ, কাওয়ালি, পপ গান, লালন আর আরবান ফোককে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিল, আমাদের মধ্যে অবলীলায় একটা বৃহত্তর ঐক্যের ধারণার জন্ম হলো। তৈরি হলো এক অভেদের ন্যারেটিভ। এক বৃহত্তর রাজনৈতিকতার আদেশে আমরা একে অপরের সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলোকে নিজের বলয়ে প্রবেশ করতে দিলাম। শত্রুভাবাপন্ন সংস্কৃতিসমূহ বৈষম্য ভুলে গেল, একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠতে চাইল। স্বৈরাচার এই নব উদ্ভাবিত সাংস্কৃতিক ঐক্যকে মোকাবিলা করতে পারল না।

কিন্তু যা আমরা জানতাম না, শত্রুবিজিত ভূখণ্ডে বিজয়ীদের ঐক্য ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই আমরা আবিষ্কার করতে থাকলাম যে আমরা আসলে আলাদা। আমাদের বিভেদ ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। ঐক্যের যে ন্যারেটিভ জনচৈতন্যের ভেতরে জন্ম নিয়েছিল, তার ক্ষণস্থায়িত্ব আমাদের আবার নিজ নিজ গোষ্ঠীর পাদদেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আমরা আবার একে অপরের সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বী (ক্ষেত্রবিশেষে শত্রু) হয়ে উঠতে থাকলাম।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব আসলে কী

সাংস্কৃতিক বিপ্লব তাহলে কি পুরোটাই আরোপিত ঘটনা? চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে বহু লেখাজোখা আছে। অন্তত দেড় মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা হয় চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়। অনেক মার্ক্সিস্ট তাত্ত্বিক বলেছেন, সমাজে বিরাজিত অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত বৈষম্যকে পাশ কাটিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্যোগ সমাজকে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। চীনে অন্তত এমনটাই ঘটেছে। দেড় মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা হয়, বহু মানুষকে জেলে যেতে হয়, বহু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, বহু সাংস্কৃতিক স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং প্রচুর পরিমাণ নিগ্রহের শিকার হয় মানুষ।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা খুবই ব্যাপক হতে পারে, আবার খুব সংকীর্ণভাবে দেওয়া যায়। আমরা যখন বলি ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’, সংস্কৃতির কোন জায়গাটা বৈপ্লবিক বদলের মধ্য দিয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনো সর্বজনমান্য ফর্মুলা কি আছে?

> আমরা যখন বলি ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’, সংস্কৃতির কোন জায়গাটা বৈপ্লবিক বদলের মধ্য দিয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনো সর্বজনমান্য ফর্মুলা কি আছে?

আবার আমরা যখন বলি ‘সাংস্কৃতিক বৈষম্য’, সেটাই-বা কী অর্থে? রাষ্ট্র কোনো একটি সংস্কৃতির প্রতি বেশি পক্ষপাত দেখাচ্ছে? সেটা তো হওয়ারই কথা? প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটা ‘প্রবল’ সংস্কৃতি থাকে। রাষ্ট্র সেটাকে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি আকারে হাজির করে। এর সঙ্গে কেন্দ্রে না থাকা সংস্কৃতিগুলোর বিপুল এবং বিচিত্র আদান-প্রদান চলে। শ্রেণি ও ক্ষমতা সম্পর্কের জায়গা থেকে দেখলে হয়তো এখানে বৈষম্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আসলে যা আছে, তা হলো বৈচিত্র্য। সমাজ যেহেতু বহুধাবিভক্ত, ফলে এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের সামনে কখনো কখনো পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক বৈষম্য হিসেবে।

চব্বিশের জুলাই আন্দোলন র‍্যাপ, কাওয়ালি, পপ গান, লালন আর আরবান ফোককে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ছবি : কবির হোসেন

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে কি এ বৈষম্যের অবসান ঘটা সম্ভব? ফরাসি তাত্ত্বিক আলা বাদিউ মনে করেন, সেটা সম্ভব। যদিও তাঁর মতে, প্যারি কমিউন কিংবা চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব অনেকগুলো জায়গায় ব্যর্থ হলেও শুধু ব্যর্থতা দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে এদের দাগিয়ে রাখা উচিত হবে না। *দ্য কমিউনিস্ট হাইপোথিসিস* বইয়ে তিনি বলছেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সফলতা-ব্যর্থতা নয়, বরং এর অভিপ্রায় দিয়েই তার মূল্য বিচার করা জরুরি। বাদিউর মতে, চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অভিপ্রায় ছিল কমিউনিস্ট প্রকল্প বা হাইপোথিসিসকে সফল করে তোলা। কারণ, সোভিয়েত সিস্টেমে কমিউনিজম আমলাতান্ত্রিকতার খুপরিতে ঢুকে গিয়েছিল। ফলে কমিউনিজম ফাংশন করবে কি না, সোভিয়েত অভিজ্ঞতা থেকে সেটা বোঝার উপায় ছিল না। পরবর্তী সময়ে যখন সোভিয়েত সিস্টেম ভেঙে পড়ল, তখন এর অন্তর্গত ভূখণ্ডগুলো তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। কারণ, সোভিয়েত-রাজ চীনের মতো কোনো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যায়নি।

কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লব কি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি যথাযথ ন্যায়বিচার করতে সক্ষম? চীনের অভিজ্ঞতা থেকে এর উত্তর নেতিবাচক। একটা কমিউনিস্ট হাইপোথিসিসকে পরীক্ষা করতে গিয়ে চীন তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর সবচেয়ে বেশি সহিংসতা করেছে। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিই যদি একমাত্র সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায়, তবে তার অবশ্যই রিপ্রিজেন্টেশনাল ক্রাইসিস থাকবে। চীনের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বাদিউও বলছেন, চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব বহুলাংশেই ডিজাস্টার হয়েছে, কিন্তু অভিপ্রায়গত মূল্য আছে এই পরীক্ষার।

রাষ্ট্রীয় পরীক্ষার বাইরেও নানান সময়ে যেসব স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে, সেগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এসব মিথস্ক্রিয়া ঘটে নানান অবকাশে। অভিবাসন ও অভ্যুত্থান—এ রকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, যখন বিদ্যমান সংস্কৃতিগুলো একে অপরকে জড়িয়ে ধরার সুযোগ পায়। বিশেষ করে অভ্যুত্থান বা রাজনৈতিক বিপ্লব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তখন গণমানুষের আত্মচৈতন্য বা সাবজেক্টিভিটি জেগে ওঠে এবং মানুষ তার খোলসের বাইরে চলে আসে ভণিতাহীনভাবে। যে কারণে গত জুলাইতে আমরা এ রকম একটি স্বতঃস্ফূর্ত মিথস্ক্রিয়া দেখি ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমের, গরিবির সঙ্গে বনেদির, র‍্যাপের সঙ্গে কাওয়ালির, ইতিহাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের।

ইতিহাসের পরিহাস হলো, এই মিথস্ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী। বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য যখন অদরকারি হয়ে ওঠে, বিশেষত বিপ্লবোত্তর সময়ে, তখন সংস্কৃতিগুলো আবার আত্মসচেতন হয়ে ওঠে, তাদের শ্রেণিচৈতন্য জেগে ওঠে। এতে সবচেয়ে বেশি আর্তবোধ করে বিপ্লবের ইউটোপিয়া। যেমন আসন্ন শীতে শুকিয়ে যেতে থাকা একটা খালের দিকে তাকিয়ে বহুকাল আগে আমি ভেঙে যাওয়া সোভিয়েত ব্যবস্থা নিয়ে লিখেছিলাম :

‘তোমার তলদেশ আবার লালায়িত
ধানচারার গোড়ার অংশ কামড়ে ধরার আশায়
প্রাদেশিক সীমারেখায় প্রকট হওয়া গোপাট-
মুখর হয়ে উঠছে
ভিতরকার লাটভিয়া এস্তোনিয়াগুলো
চতুর্দিকে শামুকের দেশপ্রেম আজ
দেশান্তরিত মৎস্য-সমাজ
হৈ হৈ হাঁসের ডামাডোলে খুব আর্ত বোধ
করছে একটি জলঢোঁড়া!’

সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রের আধিপত্য ও প্রান্তের নীরবতা

কাজী মারুফুল ইসলাম

অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতির সামনে প্রধান প্রশ্নটা কে ক্ষমতায় আসবে তা নয়, বরং রাষ্ট্রের কাঠামো কেমন হবে—এই প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে ক্ষমতার ভারসাম্য এত দিন ঢাকার কেন্দ্রভূমিতে আটকে ছিল, এখন সেটিকে নতুনভাবে কল্পনা করার সময় এসেছে।

কেমন হবে সেই নতুন কাঠামো? সেখানে কেন্দ্র ও প্রান্তের সম্পর্ক কীভাবে পুনর্গঠিত হবে? এই কাঠামোয় সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগণ, কীভাবে নিজের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন ও চাহিদার জন্য জায়গা তৈরি করবে? গণতন্ত্র যদি কেবল ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জীবনের প্রতিদিনের বাস্তবতায় প্রভাব ফেলতে চায়, তবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতেই হবে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থার মৌলিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

নামেই বিকেন্দ্রীকরণ

বাংলাদেশের উন্নয়ন-কাহিনি প্রায়ই কেন্দ্রের সাফল্যের গল্পে আটকে থাকে। ঢাকামুখী অর্থনীতি, নীতি, প্রশাসন ও ক্ষমতার একচেটিয়া প্রবাহই এ দেশের রাজনীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এই কাঠামোতে গ্রাম, উপজেলা, ইউনিয়ন থাকে সিদ্ধান্তের বাইরে। বস্তুত বাংলাদেশে কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যকার প্রকট বৈষম্য টিকে আছে কেন্দ্রের তুলনায় ক্ষমতাহীন এবং কেন্দ্রের ওপরে নির্ভরশীল বৈষম্যমূলক স্থানীয় সরকারব্যবস্থার মাধ্যমে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা একধরনের ঐতিহাসিক বৈষম্যের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এটি নামেই 'বিকেন্দ্রীকৃত', বাস্তবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ ছায়ায় আবদ্ধ। গ্রামীণ ইউনিয়ন পরিষদ, যা সবচেয়ে পুরোনো ও জনগণের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান—আজ কার্যত মন্ত্রণালয়ের এক্সটেনশন অফিস। তাদের বাজেট, প্রকল্প, এমনকি কর্মচারী নিয়োগও নির্ধারিত হয় ঢাকায়।

শহরের সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা ভোগ করে এবং তাদের সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। কারণ, তারা কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের অংশ। উদাহরণস্বরূপ—ঢাকায় একজন নাগরিকের জন্য যে পরিমাণ রাজস্ব ব্যয় হয়, তা একটি গ্রামীণ ইউনিয়ন পরিষদের মানুষের জন্য ব্যয়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি। অথচ এখনো প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ বাস করে গ্রামে, যেখানে সন্তানের জন্মনিবন্ধন থেকে শুরু করে বয়স্ক ভাতা বা আশ্রয় প্রকল্প—সবকিছুতেই ইউনিয়ন পরিষদের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের হাতে বাজেট, কর্মী, প্রযুক্তি বা নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে।

এই কাঠামো কেবল প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতারও প্রতিফলন, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কিছু গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত, প্রান্তিক মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চাহিদা রয়ে যায় প্রান্তেই।

উপজেলা, ইউনিয়ন ও জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হলেও তাঁদের বাস্তব ক্ষমতা সীমিত। বাজেট, উন্নয়ন প্রকল্প বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের চাবিকাঠি থাকে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের হাতে। ফলে প্রান্তিক জনগণ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রতিফলিত করতে পারেন না। এ কারণেই উন্নয়ন পরিকল্পনা অনেক সময় মানুষের বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না; যেখানে রাস্তা আছে, সেখানে আবার রাস্তা হয়, আর যেখানে বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ দরকার, সেখানে বরাদ্দ মেলে না।

রাজনৈতিক অর্থনীতির বাস্তবতা

এই অন্যায্য ও অসম কাঠামো কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়; বরং একটি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস, যেখানে ক্ষমতা, সম্পদ ও প্রভাব কিছু এলিট গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। নয়া মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে রাষ্ট্রকে দেখা হয় এলিট শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী যন্ত্র হিসেবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক নয়, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিকও বটে, যারা ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের নিয়ম নির্ধারণ করে।

কেন্দ্রীকৃত কাঠামো মানে ক্ষমতা সীমিত মানুষের হাতে। সিদ্ধান্ত হয় ঢাকায়, কিন্তু তার প্রভাব পড়ে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের জীবনে। এই 'এলিট ক্যাপচার'-এর ফলে স্থানীয় মানুষ, বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো নীতিনির্ধারণ থেকে ছিটকে যায়। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে যেসব প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামো তৈরি হয়, তা প্রকৃত অর্থে অংশগ্রহণমূলক হতে পারে না। কারণ, সিদ্ধান্তের বাস্তব ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। ফলে গণতন্ত্র কেবল ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, নাগরিক অংশগ্রহণ হয়ে যায় প্রতীকী। স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে যে নৈরাজ্য, দুর্নীতি বা হীনম্মন্যতা দেখা যায়, তা এই কাঠামোগত অক্ষমতারই প্রতিফলন।

> স্থানীয় প্রশাসনকে জবাবদিহিমূলক ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম করে তুলতে না পারলে গণতন্ত্র কেবল রাজধানীমুখী আড়ম্বর হয়ে থাকবে।

এখন প্রশ্ন হলো কেন এই অসম কাঠামো এত দিন টিকে আছে? উত্তর লুকিয়ে আছে রাজনৈতিক অর্থনীতির যুক্তিতে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি পারস্পরিক নির্ভরতার চক্র তৈরি হয়েছে। রাজনীতিকেরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান প্রশাসন ও সম্পদ, আমলারা চান নীতি ও প্রক্রিয়ার সালিকানা। উভয় পক্ষই এই কেন্দ্রীকরণ থেকে লাভবান। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসনের জন্য এই বৈষম্য আসলে একটি 'ইনসেনটিভ স্ট্রাকচার' এবং এখানেই নিয়ন্ত্রণ, নিয়োগ, প্রকল্প ও সম্পদ বণ্টনের সুযোগ। বিকেন্দ্রীকরণ মানে এই নিয়ন্ত্রণ হারানো। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বার্থ এই কেন্দ্রীভূত কাঠামো টিকিয়ে রাখার মধ্যেই নিহিত। ফলে সংস্কারের প্রস্তাব যতই থাকুক, বাস্তবায়িত হয় না। বাস্তবে বিকেন্দ্রীকরণ মানে রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র ও অর্থনৈতিক অভিজাত শ্রেণির মধ্যকার স্বার্থের শৃঙ্খল ভাঙা। তা সম্ভব হয়নি। এটাই স্থানীয় সরকারব্যবস্থা সংস্কারের মূল রাজনৈতিক বাধা।

সংস্কার কেন জরুরি

এই বৈষম্যের ফল শুধু প্রশাসনিক দুর্বলতা নয়, এটি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সংকোচনও ঘটায়। যখন মানুষ দেখে তাদের প্রতিনিধি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, তখন তাদের অংশগ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে যায়। গণতন্ত্র তখন পরিণত হয় একধরনের ওপর-নিচের সম্পর্কের খেলায়, যেখানে সাধারণ নাগরিক হয়ে যান দর্শক, অংশগ্রহণকারী নন।

তাই নতুন বাংলাদেশ নিয়ে যে রাজনৈতিক কল্পনা তৈরি হচ্ছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সংস্কার। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন নয়, ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া, যেখানে কেন্দ্রের নয়, প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা ও চাহিদা হবে রাষ্ট্রনীতির প্রারম্ভিক বিন্দু।

সংস্কার মানে, প্রথমত, আর্থিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব রাজস্ব আহরণের ক্ষমতা ও উন্নয়ন বাজেটে সরাসরি প্রবেশাধিকার দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ—উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি করতে হবে নির্বাচিত পরিষদের কাছে, বিপরীত নয়। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রসার—যেখানে নাগরিকেরা বাজেট-প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা ও তদারকিতে সরাসরি যুক্ত থাকবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আন্তরিকতা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্ত কেন্দ্র-প্রান্ত বৈষম্যের দিকটি নতুন করে সামনে এনেছে। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনা হঠাৎ বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এসেছে এমন সময়ে, যখন বন্দর কার্যক্রমে বড় কোনো অভিযোগ ছিল না। এ ধরনের সিদ্ধান্তে স্থানীয় বা জাতীয় কোনো পরামর্শপ্রক্রিয়া দেখা যায়নি। আবার পুলিশের সংস্কার, স্থানীয় সরকার কমিশনসহ নানা সংস্কার কমিশনের শতাধিক বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ আজও অন্ধকারে পড়ে আছে। প্রশ্ন জাগে—এই বিলম্ব কি কেবল প্রশাসনিক জটিলতা, নাকি কোনো অদৃশ্য স্বার্থগোষ্ঠীর নীরব প্রতিরোধ?

নতুন রাজনৈতিক কল্পনা : বিকেন্দ্রীকরণের পথ

গণ-অভ্যুত্থানের পর 'নতুন বাংলাদেশ' নিয়ে যে জনকল্পনা তৈরি হয়েছে, তার বাস্তব ভিত্তি গড়ে তুলতে হলে বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া পথ নেই। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাগুলোর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বাড়াতে হবে। স্থানীয়ভাবে কর আদায়ের ক্ষমতা, প্রকল্প নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ, স্থানীয় বাজেটের স্বচ্ছতা ও নারী নেতৃত্বের সুযোগ—এসবকে কেন্দ্র করে একটি নতুন সামাজিক চুক্তি তৈরি করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা হতে হবে নীতিনির্ধারণ ও সহায়তার, নিয়ন্ত্রণের নয়। স্থানীয় প্রশাসনকে রাজনৈতিকভাবে জবাবদিহিমূলক ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম করে তুলতে না পারলে গণতন্ত্র কেবল রাজধানীমুখী আড়ম্বর হয়ে থাকবে। গণ-অভ্যুত্থান আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, গণতন্ত্রের আসল মাপকাঠি রাজধানীর রাজনীতি নয়, বরং প্রান্তের মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনা। রাষ্ট্রের শক্তি তখনই টেকসই হয়, যখন সিদ্ধান্ত ও সম্পদ বিতরণে সমতা থাকে। তাই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার পরবর্তী ধাপ হতে পারে একটি অংশগ্রহণমূলক বিকেন্দ্রীকরণ, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি করপোরেশন পর্যন্ত প্রত্যেক নাগরিক অনুভব করবেন, রাষ্ট্র তাঁর নিজের।

কেন্দ্র ও প্রান্তের ব্যবধান ঘোচাতে স্থানীয় সরকার সংস্কার কেবল প্রশাসনিক কাজ নয়; এটি নতুন বাংলাদেশের রাজনৈতিক কল্পনার বাস্তব রূপরেখা হতে পারে, যেখানে উন্নয়ন ও গণতন্ত্র উভয়ই নিচু স্তর থেকে ওপরের দিকে গড়ে উঠবে।

প্রান্তিক মানুষের সেবা পাওয়ার কথা ইউনিয়ন পরিষদে। বরিশাল সদরের শায়েস্তাবাদ ইউপি কার্যালয়। ছবি : প্রথম আলো

ফ্ল্যাট বা প্লট কেনার আগে অবশ্যই জেনে নিন,
ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানটি

রিহ্যাব এর সদস্য কিনা?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী সকল ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানকে রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)-এর সদস্য পদ আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। রিহ্যাব সদস্য ছাড়া রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করা আইনত অবৈধ। সদস্য ছাড়া রিহ্যাব-এর লোগো ব্যবহার করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সদস্য ডেভেলপার, ভূমি মালিক ও ফ্ল্যাট/প্লট ক্রেতাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে আপোষ-সমঝোতায় নিষ্পত্তির জন্য "রিহ্যাব মেডিয়েশন এ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিস সেল" এ দরখাস্ত করুন।

জনসচেতনতায়

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

ন্যায়বিচার নেই, কারণ কাঠামোটাই বৈষম্যমূলক

রাশেদ রাহম
আইনের ইতিহাস গবেষক

নয়া উদারনৈতিক দুনিয়ায় আদর্শ রাষ্ট্র বা ন্যায্য শাসনব্যবস্থার প্রধান কয়েকটি বুলি হচ্ছে 'আইনের শাসন', 'মানবাধিকার' ও 'গণতন্ত্র'। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের ত্রাণসহায়তা ও বিনিয়োগের অন্যতম শর্ত আইনের শাসন। এমনকি রাশিয়া, চীন প্রভৃতি কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার দেশগুলোও আইনের শাসনের পক্ষে কথা বলে। বস্তুত যেকোনো সরকারের বৈধতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি আইনের শাসন।

কিন্তু আইনের শাসন আসলে কী? সহজভাবে বললে ব্যাপারটা এই যে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন বা আইনের অধীন। শাসনকার্য পরিচালিত হবে শুধু আইনসাফিক, আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, আইনের অনুমোদন ছাড়া কারও অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না, সবাই আইনের সমান সুরক্ষা পাবে ইত্যাদি।

এখানে আইনের শাসন প্রধানত কিছু পদ্ধতি নির্দেশ করে। আইন কীভাবে তৈরি হবে (গণতান্ত্রিক না স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে), তার উপাদানগুলো কী হবে (মৌলিক অধিকার, ন্যায্যতা, সমতা, ন্যায়বিচার থাকবে কি না)—এসব বিষয়ে কিছু বলে না। এই ধারণায় চরম কর্তৃত্ববাদী সরকারও দাবি করতে পারে যে সে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে; কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে সে স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকেও আইনসিদ্ধ করে নিতে পারে।

> থানা মামলা না নিলে কোর্টে নালিশি মামলা দায়ের করতে হয়। আদালত তদন্তের জন্য পুলিশের কাছে পাঠান।

আইনের শাসনের সবচেয়ে সমাদৃত ধারণায় বলা হয়, আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামোর পাশাপাশি আইন প্রণয়নপ্রক্রিয়ায় জনগণের সম্মতি বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকতে হবে। এখানে আইনসিদ্ধতার পাশাপাশি বৈধতার ধারণা গুরুত্ব পায়। আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামো ছাড়া গণতন্ত্র বর্শহীন; কারণ, নির্বাহী বিভাগ আইনের পরিধি নিজের ইচ্ছেমতো কমাতে-বাড়াতে পারে। একইভাবে গণতন্ত্র ছাড়াও আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামো বৈধতার সংকটে পড়ে। এখানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার কেবল প্রত্যক্ষ আইনের উপাদান নয়, বরং পুরো ব্যবস্থার বৃহত্তর পটভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ ও তার জুডিশিয়াল রিভিউর ক্ষমতা হবে ভারসাম্যের কেন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগকে এখানে সালিসকার হিসেবে কাজ করার কর্তৃত্ব দেওয়া থাকে।

আইনের শাসনের এই ধারণার সারমর্ম দাঁড়ায়—আইনের শাসনে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা আইন-নির্ধারিত আওতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মৌলিক অধিকার অনুযায়ী এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতের অধীন কাজ করবে। আইন প্রণীত হবে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী প্রক্রিয়ায়; মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোনো আইন প্রণীত হবে না। আইন প্রয়োগকারীদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জুডিশিয়াল রিভিউর সুরক্ষা থাকবে; ক্ষমতার পৃথক্‌করণ, মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিরপেক্ষ আদালতে সহজ, দ্রুততর ও হয়রানিমুক্ত প্রবেশাধিকার থাকবে। সর্বোপরি নাগরিকদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেও আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশেও আইনের শাসনের এসব নীতিমালা গৃহীত হয়েছে, পাঁচ দশকের সব শাসকই মুখে মুখে তা প্রতিষ্ঠার কথা বলে এসেছেন। কিন্তু এই আইনের শাসন আসলে আমাদের জন্য কী বয়ে এনেছে আর কী আনতে যাচ্ছে?

২

বাংলাদেশে আইন প্রণয়ন করা হয় জাতীয় সংসদে, জনগণের নির্বাচিত 'জনপ্রতিনিধি'দের মাধ্যমে। এটা আইন প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া মাত্র। আসলে আমাদের আইন প্রণীত হয় সচিবালয়ে, আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, পুরোপুরি নির্বাহী বিভাগের প্রয়োজনায়। আইনের খসড়া তৈরি করেন আমলারা। ফলে দণ্ডবিধিতে সুস্পষ্ট বিধান থাকার পরও প্রতিটি আইনে আমলাদের জন্য 'সরল বিশ্বাসে কৃতকর্মের' জন্য দায়মুক্তির বিধান রাখা হয়। খসড়া তৈরিতে সাহায্য করেন ক্ষমতাসীন দলের অনুগত শিক্ষক-পরামর্শক-বুদ্ধিজীবীরা।

বিলের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর আইন মন্ত্রণালয়ে যায়। মন্ত্রিসভার অনুমোদন মানেই প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন। তারপর প্রধানত কারিগরি ত্রুটিবিচ্যুতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সংসদে যেতে পারে আইন হিসেবে পাস হওয়ার জন্য। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর তা সংসদে পাস না হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। সংসদের গোটা সময়ের মধ্যে আইন প্রণয়নে ব্যয় হয় সর্বোচ্চ ১০-১২ শতাংশ। ২০-৩০ মিনিটেই একটা বিল পাস হয়ে যায়। সেখানে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কেবলই 'হ্যাঁ জয়যুক্ত' হয়।

জাতীয় সংসদের অধিবেশন না থাকলে বা সংসদ ভেঙে দেওয়া হলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যেহেতু ক্ষমতাহীন, তাঁর নামে এই ক্ষমতাও চর্চা করেন প্রধানমন্ত্রী কিংবা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। সংসদের পরবর্তী অধিবেশনের সংসদে তা অনুমোদিত হয়। সংসদে গৃহীত আইনের প্রায়োগিক নীতিমালার জন্য প্রণীত হয় বিধি বা প্রবিধিমালা। এগুলো পুরোপুরি আমলাতান্ত্রিক প্রয়োজনা। অংশীজনদের মতামত চাওয়া হয়, জনপরিসরে বিভিন্ন তর্কবিতর্ক ওঠে, কিন্তু চূড়ান্ত খসড়ায় সেসবের কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না।

৩

আইনের শাসন অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক আইনের সমান সুরক্ষা পাবেন এবং রাষ্ট্র আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন হবে, নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করবে না। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুনিবন্ধন, জমিজমা, ব্যবসার নিবন্ধন, পেনশন উত্তোলন ইত্যাদি ন্যূনতম প্রাথমিক নাগরিক সেবায় হয়রানির শেষ নেই। নাগরিক নিরাপত্তা নেই, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা নেই। আপনি প্রতিবাদে যাবেন, রাষ্ট্র আপনাকে লাঠিপেটা করবে, গুলি করবে, গ্রেপ্তার করবে, কারাগারে ঢোকাবে; নয়তো গুম-খুন করবে; আবার 'পালিয়ে গেছেন' বা 'জঙ্গি দলে যোগ দিয়েছেন' বলে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে কালিমালিপ্ত করবে, ভুয়া মামলা দেবে, জামিন চাইলে দেবে না, দিয়ে আবার জেলগেটে নতুন মামলা দেবে। আপনি যাবেন আদালতে, কিন্তু আদালতেও আপনি ন্যায়বিচার পাবেন না। কারণ, কাঠামোটাই বৈষম্যমূলক।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের (২০২৫) জরিপ অনুযায়ী, ৮০.১০ শতাংশ নাগরিক মনে করেন, আইনজীবীরা অহেতুক সময় নষ্ট করেন। ৯০ শতাংশ মনে করেন, আদালতের কর্মচারীরা হয়রানি করেন। ৮৪ শতাংশ মনে করেন, কর্মচারীরা ঘুষ চান। আইনজীবীরা আদালত বর্জন করেন, মুলতবি করেন আর করেন রাজনীতি। জামিন না পেলে, পছন্দমতো অর্ডার না পেলে বিচারকদের হুমকি দেন। বিচারকের অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম। বিচারকেরা কোর্টে উঠতে দেরি করবেন। মুহুরি, পেশকারদের বকশিশ দিতে হবে। এরপর এক অনন্ত গোলকধাঁধায় ঘুরতে থাকা। কমপক্ষে ১৫ থেকে ১৮টি ধাপ। সমন হতে দেরি হবে, প্রতিপক্ষ বারবার সময় চাইবে, অন্তর্বর্তী আদেশ চাইবে। দিন যাবে, দশক যাবে, উত্তর প্রজন্ম হাল ধরবে, আদালত আপনার নথিও হারিয়ে ফেলবেন, আপনার উত্তর পুরুষ আদালত আর উকিলের চেম্বারের চারপাশে ঘুরতে থাকবে, ৫ বছর, ২০ বছর, ৫০ বছর।

মামলার দীর্ঘসূত্রতাসহ নানা কারণে রায়প্রত্যাশী অনেকে হয়রানির শিকার হন। ছবি : প্রথম আলো

৪

ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার প্রবেশদ্বার থানা বা পুলিশ। থানায় জিডি বা অভিযোগ করে প্রতিকার চাইতে হবে। আগে জিডি করতে টাকা দিতে হতো; এখন অনলাইন জিডির কথা বলা হয়, কিন্তু সার্ভার সমস্যা, পুলিশের অনীহা-অসহযোগিতা আপনাকে ভোগাবে। আমলযোগ্য মামলায় অভিযোগ করতে হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করে মামলা গ্রহণ করে। কিন্তু অভিযোগের কোনো রেকর্ড রাখা হয় না বলে পুলিশের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে। পুলিশ মামলা নিতে গড়িমসি করবে। মামলা নিলে তদন্ত কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হবে। তবু তদন্তে হেলাফেলা, সময়ক্ষেপণ চলবে।

থানা মামলা না নিলে কোর্টে নালিশি মামলা দায়ের করতে হয়। আদালত তদন্তের জন্য পুলিশের কাছে পাঠান। এরপর আদালতে পিপির দায়িত্বহীনতা, ঘুষ গ্রহণের প্রবণতা, মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা জেনেও সরকারের তাঁবেদার হয়ে জামিনের বিরোধিতা করা। পুলিশ/প্রসিকিউশন সাক্ষী হাজির করতে পারবে না, নানা কারণে মামলা ঝুলতে থাকবে। জামিনের জন্যও খরচ করতে হবে প্রচুর, খরচ করার ক্ষমতা না থাকলে বিনা বিচারে জেলে পচতে হবে। সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিকার পেতে যেতে হবে উচ্চ আদালতে। এটা ব্যয়বহুল, সাধারণের নাগালের বাইরে।

৫

এর মধ্যে সমস্যা সমাধানে নানা প্রচেষ্টা থাকবে। থাকবে আনুষ্ঠানিক, প্রক্রিয়াগত সংস্কারের উদ্যোগ। বিচারকের সংখ্যা বাড়ানো, পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা। কিছু বাস্তবায়িত হবে, কিছু হবে না। স্বতন্ত্র তদন্ত ও প্রসিকিউশন সংস্থা হবে না। হয়রানিমূলক মামলার জন্য বিশেষ ক্ষমতা আইন হয়তো কিছুদিন ব্যবহৃত হবে না, কিন্তু 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন' হবে। পুলিশকে একবার বলা হবে, মামলা নাও। হরেদরে মামলা নেবে, বাণিজ্য হবে। আবার বলা হবে, হয়রানিমূলক মামলা বন্ধ করো। সাধারণ নাগরিক মামলা করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হবে। কখনো আসামি জামিন পাবে না, কখনো কয়েক ঘণ্টায় কয়েক হাজার জামিন পেয়ে যাবে। এর মধ্যে আমরা শুনতে পাব 'বিচার বিভাগে ঘোষিত সংস্কার কর্মসূচির প্রায় ৮০ শতাংশ ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে'। মানে 'আইনের শাসন' বারো আনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে!

এটা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আইন ও বিচার বিভাগকে আমরা দেখি পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, যেন-বা পদ্ধতি ঠিক করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই মানসিকতার কারণে আমরা আইনের শাসনকে রাজনৈতিক-দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস হিসেবে পাঠ করতে পারি না। 'আধুনিক রাষ্ট্র' তৈরিই হয়েছে উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে স্থান দেওয়া হয় জনগণের সার্বভৌমত্বের ওপর। আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতার গঠন ও ক্রমবিস্তার পর্যালোচনামূলকভাবে পাঠ করতে পারাই সবচেয়ে জরুরি কাজ।

অন্তর্ভুক্তির ধারণা হোঁচট খেয়েছে, বিভক্তি ফিরছে নতুন রূপে

সাঈদ ফেরদৌস
সহ-উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আওয়ামী লীগ তার শাসনামলে যখন থেকে 'সর্প হইয়া দংশন করে ওঝা হইয়া ঝাড়া'র নীতি গ্রহণ করেছিল, তখন থেকেই দলটির সেক্যুলার, প্রগতিপন্থী হিতাকাঙ্ক্ষীরা মনে মনে প্রমাদ গুনেছিলেন যে এই ভ্রান্ত নীতির কারণেই দূর অথবা অদূর ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে নাগার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর বাঁধভাঙা উত্থান ঘটবে। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, ইসলামপন্থার সেই বাঁধভাঙা উত্থান হবে অসহিষ্ণু, পাল্টা আধিপত্যকামী।

শেখ হাসিনা নেতা-কর্মীদের অন্ধকারে রেখে জনরোষ থেকে বাঁচতে প্রাণভয়ে এভাবে পালিয়ে যাবেন, সেটা দিব্যচোখে দেখা না গেলেও তাঁর কর্তৃত্বপরায়ণ শাসন যে একদিন ভেঙে পড়বে, তা অনেকেই ভেবেছিলেন এবং সেই মাঠ ইসলামপন্থীদের দখলে চলে যাবে, এ কথাও কল্পনাতীত কিছু ছিল না। মুশকিল হলো, এসব বুঝতে পেরেও আওয়ামী লীগের শুভার্থীরা, তার মিত্র বামপন্থী সংগঠনগুলো তাঁদের নেতা-নেত্রীদের ধর্মের কার্ড খেলার বিপজ্জনক রাজনীতি থেকে ফেরাতে পারেননি।

অন্যদিকে লীগের প্রতি বিশেষ কোনো পক্ষপাত নেই, তাদের চেতনা ব্যবসা সম্পর্কেও সম্যক সচেতন—এমন প্রগতিশীল মানুষজন কিংবা সংগঠনগুলোও আসন্ন ইসলামপন্থার সঙ্গে কীভাবে বোঝাপড়া করবেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছিলেন, এমন আভাস দেখা যায়নি। আমার মনে আছে, ২০২২ সালের ২৩ জুলাই অধ্যাপক আলী রীয়াজের একটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে আমি অনাগত ইসলামপন্থা প্রসঙ্গে কথা বলেছিলাম; অনুষ্ঠান শেষে আমার এক বামপন্থী তরুণ বন্ধু ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে ইসলামপন্থীরা বাংলাদেশে আসবেই—এ কথা আমি বলে দিলাম! উনি কেন কথাটা বলেছিলেন আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা নিছকই অনুচ্চারিত আশঙ্কা কিংবা দূরবর্তী সম্ভাবনামাত্র ছিল এমন নয়।

আওয়ামী লীগ এক হাতে জঙ্গি দমনের নাটক করেছে, অন্য হাতে হাসিনার কওমি জননীর মুকুট রক্ষা করেছে। চব্বিশের জুলাইয়ের আগুনঝরা যেসব দেয়াললিখন আমাদের অনেকের চোখ খুলে দিয়েছিল, তার একটা ছিল, 'সঙ্গে থাকলে সঙ্গী, না থাকলে জঙ্গি'! এই সরল উপলব্ধি বিগত রেজিমে যেনবা বিদ্বজ্জনেরা ধরতেই পারেননি। উল্টো, লীগের নেতৃত্ব এই প্রশ্ন আমাদের মগজে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে যে 'বিকল্প কে?' তারা এই আওয়াজ ছড়িয়ে দিতে পেরেছে যে তারা না থাকলে জঙ্গিরা সব দখল করে নেবে।

এই জুজুর ভয়ের কারণেই সেক্যুলারদের একটা বড় অংশ ভয়াবহ দুর্নীতি, নিপীড়ন, দুঃশাসন দেখার পরও আওড়ে গেছেন, 'বিকল্প কে?' সমাজের সেক্যুলার ও প্রগতিপন্থীদের একটা বড় অংশ আওয়ামী শাসনের প্রতি হেলে থাকার বাস্তবতা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারবেন না, এ কথা সত্য। কিন্তু একইভাবে আওয়ামী লীগের পতনের পর বাংলাদেশে একটা নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। ইসলামপন্থার উত্থান প্রসঙ্গে সেক্যুলারদের মোটাদাগে যে আশঙ্কা ছিল, এখন সরব ইসলামপন্থী রাজনৈতিক ধারাগুলোর কারও কারও ভাষা, ভঙ্গি, উপস্থিতি ও তৎপরতা, তাকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সামনের দিনে বিবিধ ইসলামপন্থীরা নিজেদের দলীয়, গোষ্ঠীগত ও সার্বিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি কীভাবে দাঁড় করাবেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

> সেক্যুলারপন্থা বিক্রি করা চেতনা ব্যবসায়ীরা বিদায় নিলেই কি নাগরিকদের সমান হিস্যা প্রতিষ্ঠিত হবে?

শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে নানা কিসিমের ইসলামপন্থাকে সরব এবং সক্রিয় হতে দেখা গেছে। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক নানা ব্যানারে তাঁরা সক্রিয় হয়েছে। কেউ গণতন্ত্র ও নির্বাচন মানেন, কেউবা আন্তর্জাতিকতাবাদী, খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ভাষা, ভঙ্গি বিচারে এঁদের কাউকে চরম ডানপন্থী, কাউকে উদারনৈতিক কিংবা মধ্যপন্থী মনে হতে পারে। নির্বাচনী রাজনীতিতে এঁরা কে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন, কার সঙ্গে কে জোট বাঁধবেন, সেসব এখনো স্পষ্ট হয়নি।

কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পরের বাংলাদেশে তাঁদের সাংগঠনিক ভিন্নতাকে ছাপিয়ে যে সত্যটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো, পরিচয়ের রাজনীতির পরিসরে তাঁরা 'ইসলামি' ক্যাটাগরি হিসেবে তাঁদের হিস্যা বলে-কয়ে আদায় করতে শুরু করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে দলমত-নির্বিশেষে একমত বলেই প্রতীয়মান হয় যে বিগত আমলে ইসলামপন্থাকে জনপরিসরে জায়গা দেওয়া হয়নি, ইসলামি পরিচয়ের স্মারক, দাড়ি, টুপি কিংবা হিজাব থাকলেই মানুষজনকে সমাজের, রাষ্ট্রের নানা পর্যায়ে বৈষম্য, দুর্ভোগ কিংবা নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল। কাজেই ইসলামপন্থীরা এসবের আশু অবসান চান—সাদাচোখে ব্যাপারটা এমনই।

এ কথা সত্য যে আওয়ামী লীগ ইসলামপন্থীদের মধ্য থেকে তাদের পছন্দসই অংশকে নিজের দলে ভিড়িয়েছিল এবং অপছন্দের অংশকে কোণঠাসা করেছিল। রাজনীতির মাঠে জামায়াতে ইসলামী যেন তাদের প্রতিপক্ষ না হয়ে উঠতে পারে, সে লক্ষ্যে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। তারা বিএনপিকে তৃণমূলে যেভাবে দমন-পীড়ন করেছিল, জামায়াতের ক্ষেত্রেও সেই কৌশল বেছে নিয়েছিল। তাই জামায়াতের ওপর আওয়ামী লীগের নিপীড়নকে ঠিক ইসলামের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হওয়া বলে দেখানো যাবে না।

কিন্তু সমস্যাটার গোড়া আরও অনেকটা গভীরে প্রোথিত। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে আইডেন্টিটি পলিটিকস বা পরিচয়ের রাজনীতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইসলামকে যেভাবে বাঙালিত্বের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামের একটা গৎবাঁধা ধারণা বা স্টেরিওটাইপ তৈরি হয়েছে, যেখানে এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে বেমানান। এই নির্মাণ এ দেশে সেক্যুলার ও ইসলামপন্থীদের মধ্যকার বিভক্তি পাকাপোক্ত করেছে।

রাষ্ট্রে সব নাগরিকের সমান হিস্যা থাকা আবশ্যক

পরের দশকগুলোতে আওয়ামী লীগ এই বিভক্তির রাজনীতিকেই লাগাতার পরিপুষ্ট করেছে। উভয় পক্ষই পরস্পরের ব্যাপারে চূড়ান্ত রকমের বিদ্বেষপ্রবণ ও অসহিষ্ণু। এই বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার পরিবেশে সেক্যুলাররা শ্রেণিগত দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন, সে তুলনায় প্রান্তিক ইসলামপন্থীরা নানা সামাজিক দুর্ভোগ ও হেনস্তার শিকার হয়েছেন। ইসলামপন্থীরা এখন সেই হেনস্তার অবসান চান, তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি চান।

রাষ্ট্রে সব নাগরিকের সমান হিস্যা থাকা আবশ্যক। কিন্তু কেবল সেক্যুলারপন্থা বিক্রি করা চেতনা ব্যবসায়ীরা বিদায় নিলেই কি নাগরিকদের সমান হিস্যা প্রতিষ্ঠিত হবে? এটা কি কেবল রেজিম বা শাসক বিশেষের সমস্যা নাকি নিপীড়নের, আধিপত্যের মন ও মগজ বদলানোর এর সঙ্গে বিষয়টা জড়িত? ৫ আগস্টের পর আমরা নতুন বন্দোবস্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের কথা বলেছি। তার প্রথম ধাপের কাজ ছিল পরিচয়ের রাজনীতিতে উপেক্ষিত প্রপঞ্চ 'ইসলাম'কে জায়গা দেওয়া। আমরা বাংলা বর্ষবরণে অনেক বছর ধরে চলে আসা মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি, তাতে সুলতানি আমলের স্মারক, প্রতীক যুক্ত করেছি।

আমরা বিগত আমলে শ্রেণিকক্ষে ধর্মীয় স্মারকের কারণে নিগৃহীত হওয়ার গল্প শুনেছি, তার প্রতিকার চেয়েছি। আমরা ধরে নিচ্ছি, এটা অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে ওঠার প্রথম ধাপ। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তির ধারণা হোঁচট খায়, যখন আমরা দেখি মফস্সলে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাজার ভাঙা হচ্ছে, খাদেমকে মারধর করা হচ্ছে, বিচারগানে বাধা দেওয়া হচ্ছে, বিবিধ সাংস্কৃতিক চর্চাকে ধর্মের নামে বাধা দেওয়া হচ্ছে, জটাধারী ফকির/পাগলকে ধরে-বেঁধে চুল কেটে গোসল করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, সংস্কৃতি, ধর্ম, ধর্মানুভূতির এই নতুন দ্বাররক্ষক কারা, যাঁরা প্রকারান্তরে সমাজে আবারও বর্জনমূলক চর্চার বিস্তার ঘটাচ্ছেন? বিশ্বাসীরা মনে করেন ধর্মের রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ। তাহলে কোন বান্দা নিজেকে ধর্মরক্ষী বানিয়ে তুলছে?

এই সমাজের বড় রোগ বিভক্তির রাজনীতি। অগ্নিঝরা জুলাইয়ে অনেক রক্ত দিয়ে এ দেশের মানুষ আশা করেছিল যে সেই রাজনীতির অবসান ঘটবে। কিন্তু জুলাইয়ের পরে মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগের বিভক্তির রাজনীতিকে সফল করার জন্য আমরা উঠেপড়ে লেগেছি। আগে রাজনীতি ও সংস্কৃতির দ্বাররক্ষক ছিল রেজিমের তল্পিবাহকেরা। তখন যাঁরা বেইনসাফির শিকার হয়েছিলেন, নিপীড়িত হয়েছিলেন, এখন কি তাঁরা দ্বাররক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন? ধর্ম ও সমাজ রক্ষার নামে অন্যকে নিপীড়ন করবেন? অন্যের প্রাপ্য ইনসাফ কেড়ে নেবেন? নাকি যে আপনাকে ইনসাফ থেকে বঞ্চিত করেছে, আপনি তার জন্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন?

বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ইসলামকে সরিয়ে রেখেছিল বলে কি ইসলামপন্থী রাজনীতি এখন বাঙালিত্ব মুছে ফেলতে চাইবে? এসনটা কি করা যায়, না এর ফল আখেরে ভালো হয়? এত রক্তক্ষয়ের পরে আমাদের প্রয়োজন ন্যায্যতা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিশোধ-প্রতিহিংসাপরায়ণতা আর যা-ই পারুক, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। যাঁরা শাসকের আসনে বসবেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, তাঁরা দল বা গোষ্ঠীর নন, সব নাগরিকের প্রতি দায়বদ্ধ। এই দেশ ও সমাজকে সবার জন্য সমান বাসযোগ্য করে গড়ে তোলাই হতে হবে তাঁদের প্রধানতম অঙ্গীকার।

ছাড়িয়ে যাই

কোটি মানুষের
জীবন ছুঁয়ে যাই

MGi
Meghna Group of Industries

Fresh
No.1 NUMBER 1
SUPER PurE
Actifit
GEAR

অভিজাততন্ত্র থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক, সিপিডি

জনসংখ্যার একটা বড় অংশ আছে অভিজাততন্ত্রের বাইরে। ছবি : প্রথম আলো

স্বাধীনতার পরের ৫৪ বছরে এবং ছয়টি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের (১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০৭ ও ২০২৪) পরেও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌল চরিত্র 'গণপ্রজাতন্ত্র' নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বরং এই রাষ্ট্র ক্রমেই একটি অভিজাততন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ পরিচয়ে রাষ্ট্রকাঠামো শক্তিশালী হয়েছে, হচ্ছে এবং হয়তো ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

অভিজাততন্ত্রের রূপ একেক দেশে একেক রকম। বাংলাদেশে অভিজাততন্ত্রে যুক্ত রয়েছে রাজনৈতিক অভিজাত পরিবার, বৃহৎ করপোরেট প্রতিষ্ঠান, চিহ্নিত আমলা, আইনশৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েকজন সদস্য, বিদেশি প্রভাবশালী গোষ্ঠী ইত্যাদি। দশকের পর দশক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালে অভিজাততন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে। পাশ্চাত্যের মূল্যবোধকেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণি বাংলাদেশে স্বার্থকেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে।

ক্ষমতার আসল উৎস কোথায়

প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার উৎস জনগণ—এ কথা সংবিধানে বলা হলেও বাংলাদেশে সব ক্ষমতার উৎস কয়েকটি অভিজাত গোষ্ঠী। এই শ্রেণির অবস্থান সরকারে, সরকারের বাইরে, প্রশাসনে, সিভিল সোসাইটিতে, দেশের বাইরে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীতে। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারে ও সরকারের বাইরে বিরোধী পক্ষ হিসেবে যাদের দায়িত্ব পালন করার কথা, বেসরকারি খাত হিসেবে যাদের প্রতিনিধিত্ব করার কথা, তারা প্রকৃত অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেনি। বরং জনগণের নামে নিজের এবং অন্য কারও স্বার্থ রক্ষায় এরা ব্যস্ত। ফলে জনসাধারণ প্রতিনিয়ত বঞ্চিত, প্রতারিত হচ্ছে।

বঞ্চিত ও প্রতারিত জনগণের এমন অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর উপায় সীমিত। রাষ্ট্রের দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি, দুর্বল মূল্যবোধ, দুর্বল নীতি, আইনের শাসনের অভাব, কালোটাকা ও পেশিশক্তির দাপটে সব সরকারের সময়েই জনগণ অভিজাততন্ত্রের বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সরকারপ্রধান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হলেও মূলত অভিজাত শ্রেণির হয়েই কাজ করেন। তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নির্দেশে মন্ত্রিপরিষদ, আমলা, পদধারী ও সুবিধাভোগী সবাই নির্ধারিত হন। ফলে জনগণের সর্বময় ক্ষমতা নির্ধারিত হয় সরকারপ্রধান দ্বারা, তাঁর মর্জিমাফিক।

কথা ছিল অভিজাততন্ত্রের মূলোৎপাটন হবে রাষ্ট্রের তিন বিভাগ—আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের কার্যকর ও গতিশীল উদ্যোগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনটি বিভাগই বহুলাংশে অভিজাততন্ত্রের করায়ত্ত। আইন বিভাগে জনগণের প্রতিনিধিরূপে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাঁদের সিংহভাগই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অভিজাততন্ত্রের পক্ষে কাজ করেন। জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের চেয়ে তাঁরা আইন প্রণয়নের সময় সংকীর্ণ ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে যেতে পারেন না। তাঁদের আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে না।

মন্ত্রিসভা আইনের খসড়া বিল তৈরি করে সংসদে পাঠায়। মন্ত্রিসভার আইনের খসড়া করে দেন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট আমলারা। সংসদে জনপ্রতিনিধিদের বেসরকারি বিল উত্থাপনের সুযোগ থাকলেও তাঁরা তা করেন না। কালেভদ্রে বেসরকারি বিল উত্থাপন হলেও তা দ্রুতই বাতিল হয়ে যায়। ফলে জনগুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে আইন প্রণয়ন হয় না। অনেক সময় আইন ত্রুটিপূর্ণভাবে পাস হয়। ফলে সংসদে অনুমোদিত আইনে জনগণের প্রত্যাশা থাকে উপেক্ষিত।

বাজেট প্রণয়নে জনগণের ভূমিকা কতটুকু

জাতীয় বাজেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের বাজেট নিয়ে কার্যকর আলোচনার সুযোগ থাকে না। জনগণের জন্য যে বাজেট, সেখানে জনগণের মতামত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ফলে জাতীয় বাজেট হয়ে দাঁড়ায় মন্ত্রণালয়ের বাজেট। বাজেটের প্রদত্ত রাজস্ব-সুবিধা চলে যায় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ব্যবসা স্বার্থে। আর্থিক বিষয়াদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য সংসদে মন্ত্রণালয় ও আর্থিক বিষয়সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি রয়েছে। কিন্তু সেসব কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের খুব কমই জনস্বার্থে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তা ছাড়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হলেও সরকারের মন্ত্রী-সচিবকে জবাবদিহির মধ্যে আনার আগ্রহ দেখা যায় না। এ অনাগ্রহের পেছনে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর চাপ থাকে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি তদারক করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলে সরকারি দলের মন্ত্রী, সরকারি ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, আমলা ও অন্যান্য ক্ষমতাধর ব্যক্তি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন।

> জনগণের নামে নিজের এবং অন্য কারও স্বার্থ রক্ষায় এরা ব্যস্ত। ফলে জনসাধারণ প্রতিনিয়ত বঞ্চিত, প্রতারিত হচ্ছে।

বিচার বিভাগের যে স্বাধীনভাবে বিচার করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার কথা, অভিজাততন্ত্রের চাপে তা-ও থেকেছে উপেক্ষিত। দশকের পর দশক সরকারি কাজে অনিয়ম, দুর্বলতা, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অভিযোগের স্বাধীন তদন্ত, বিচার ও রায় না হওয়ার কারণে অভিজাততন্ত্র আরও জেঁকে বসেছে। বিচারকের নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যমান্য নিয়োগ বিধিমালা দশকের পর দশক ধরে মানা হয়নি। স্বাধীন বিচারের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। স্বাধীন বিচার বিভাগ যদি আইন বিভাগের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় কাজ করতে পারত, তাহলে জনগণের শাসন, জনগণের আইন ও তার প্রয়োগ অনেক ভালোভাবে হতে পারত।

নির্বাহী বিভাগ অভিজাততন্ত্রের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে যথেচ্ছভাবে। বিভিন্ন খাতে সরকারের নীতি, কৌশল ও পদক্ষেপ নির্ধারিত হয়েছে প্রভাবশালীদের চাপে, দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর প্রভাবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জনগণের কল্যাণের নামে তথাকথিত প্রকল্প তৈরি করে, অতি উচ্চ ব্যয় দেখিয়ে, পরিচিতদের টেন্ডারপ্রক্রিয়ায় কাজ দিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় করেছে। প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। প্রকল্প নেওয়ার জন্য সরকারের নীতি ও কৌশল সাজানো হয়েছে। আবার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থের অভাবে কাজ না হওয়ায় জনগণ বঞ্চিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ, সামাজিক সুরক্ষার অনগ্রসরতার কথা বলা যায়।

শোষণমূলক উন্নয়ন কাঠামো

বিগত দশকগুলোতে যে অপচয়মূলক ও শোষণমূলক উন্নয়নকাঠামো চালু হয়েছে তাতে জনগণের যে কিছুই উন্নয়ন হয়নি, তা নয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিপুল অর্থের ব্যবহারে 'চুইয়ে পড়া' (ট্রিকল ডাউন) অর্থনীতি তৈরি হয়েছে, যা আংশিক হলেও জনগণের কাজে লেগেছে। তবে এ বিপুল উন্নয়ন ব্যয়ের মাধ্যমে জনগণের উপকার হতে পারত আরও বহুগুণ। বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে সরকার, আমলা, প্রশাসন ও ব্যক্তি খাতের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী জনগণের উন্নয়নে কাঠামো নির্ধারণের দায়িত্ব কুক্ষিগত করেছে। এ কাঠামোতে প্রকৃত জনকল্যাণমুখী পরিবর্তন অসম্ভব। অভিজাততন্ত্রের কাঠামো ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন পছন্দ করে, বিকেন্দ্রীকরণ অপছন্দ করে। এ কাঠামোর সুবিধাভোগীরা স্থানীয় সরকারের হাতে বেশি ক্ষমতা দিতে চান না; জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করুন কিংবা স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব উত্তোলন ও ব্যবহার করা হোক—এসব তাঁরা চান না। তাঁরা কেন্দ্রে বসে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চান।

প্রত্যাশা ছিল, দেশ অভিজাততন্ত্রের কাঠামো ভেঙে জনগণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবে। রাজনৈতিক কাঠামোতে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে; অর্থ ও পেশির দৌরাত্ম্য দূর হবে; রাজনৈতিক দলগুলোয় অর্থের অযাচিত ব্যবহার বন্ধ হবে; তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাবে স্বচ্ছতা আসবে। কেউ অর্থের বিনিময়ে পদ-পদবি বা টেন্ডার ইত্যাদি করায়ত্ত করতে পারবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে নির্বাচনের মাধ্যমে; দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থে রাষ্ট্রকাঠামোর ব্যবহার হবে না।

প্রত্যাশা ছিল, অভিজাততন্ত্র রুখতে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগে মৌলিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্য হবে। বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের যেসব প্রস্তাব রাজনৈতিক দলগুলো করেছে এবং ভবিষ্যতে করবে বলে অঙ্গীকার করেছে, সেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার অনুপস্থিত। এর অর্থ, জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রচলিত পন্থাই বহাল থাকবে; অভিজাত গোষ্ঠী, বিশেষত কয়েকটি পরিবার ও করপোরেট গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, দেশি-বিদেশি স্বার্থগোষ্ঠী আগামী দিনেও সংসদে, সরকারে এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় তাদের প্রভাব অব্যাহত রাখার সুযোগ পাবে।

জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি—স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধি, শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি, নারীর প্রতিনিধি, যুব-যুবার প্রতিনিধি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, প্রবাসীদের প্রতিনিধি, তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধি—আগামী দিনেও বহুলাংশে উপেক্ষিত থাকবে সংসদে, স্থানীয় সরকারে এবং অন্যান্য নির্বাচিত কাঠামোয়। এ উপেক্ষা দৃশ্যমান হবে আইন প্রণয়নে, সরকার পরিচালনায়, স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে এবং এমনকি বিচারিক প্রক্রিয়ায়। এ দেশের কি অভিজাততন্ত্র থেকে মুক্তি নেই?

Transcom
tradition in excellence

A Legacy Built on Ethics

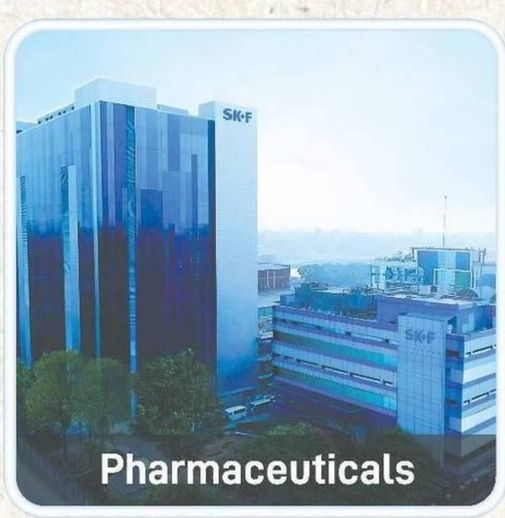

SK+F Eskayef Pharmaceuticals Ltd.

Transcom Beverages Ltd.

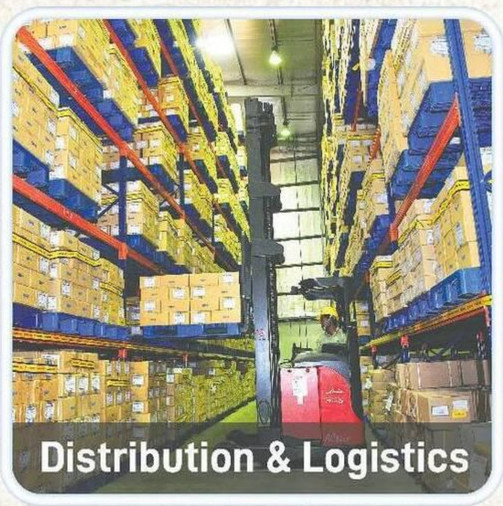

Transcom Distribution Co. Ltd.

Mediastar Ltd.

Transcom Consumer Products Ltd.

Transcom Foods Ltd.

Transcom Electronics Ltd.

Bangladesh Lamps Ltd.

Transcraft Ltd.

Global Appliances Ltd.

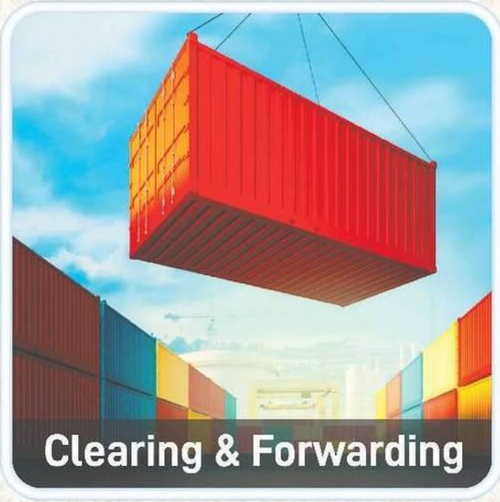

Tea Holdings Ltd.

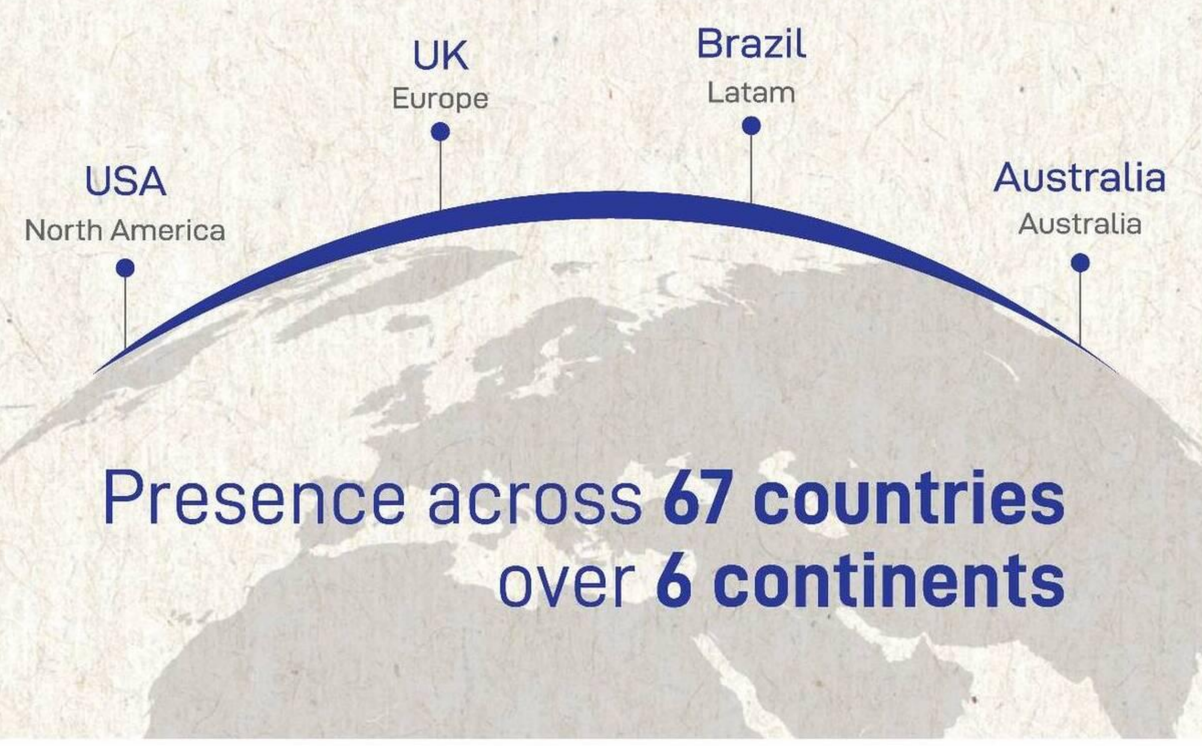

Presence across **67 countries**
over **6 continents**

www.transcombd.com

গ্রাম ও শহর : বৈষম্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়া যেখানে চলমান

খান মো. রবিউল আলম

যোগাযোগ পেশাজীবী
ও শিক্ষক

কৃষি অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হলেও প্রান্তিক কৃষক বৈষম্যের শিকার। ছবি : প্রথম আলো

তথ্যে-উপাত্তে দেখা যাচ্ছে, আর্থসামাজিক সূচকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য কমছে। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) 'স্টেট অব দ্য রিয়েল ইকোনমি' শীর্ষক জাতীয় সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। সম্ভবত এ অগ্রগতির মূল উপাদান পাকা সড়ক নেটওয়ার্ক এবং দেশব্যাপী বিদ্যুৎ-সংযোগ। সেই সঙ্গে মানুষের মনে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা।

পিপিআরসির ওই সমীক্ষায় উল্লেখিত অগ্রগতি মানুষের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যোগ প্রমাণ করেছে। এই অর্জিত অগ্রগতি ধরে রাখতে হবে। জুলাই-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে রাজনৈতিক সংস্কার যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, অর্থনৈতিক সংস্কার ততটা পায়নি। জুলাই আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক ছিল না, এর গভীরে ছিল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

ব্যবসায় ভীতিকর অবস্থা

দেশের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, চাঁদাবাজি, লুটপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখল বা মালিকানার হাতবদল বৃহৎ, মাঝারি ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের ভীতিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে নিয়েছেন বা সংকুচিত করেছেন। এ কারণে স্থানীয় পর্যায়ে টাকার প্রবাহ কমেছে। দ্বিতীয়ত, কিছুসংখ্যক ব্যাংকের নাজুক অবস্থার কারণে প্রান্তিক বিনিয়োগকারীরা বেশ বিপাকে পড়েছেন। তৃতীয়, সরকারি অনেক প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে, নতুন প্রকল্পের সংখ্যা কমে এসেছে। ফলে প্রান্তিক পর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষের কাজের সুযোগ কমেছে।

পিপিআরসির সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, গণ-অভ্যুত্থানের পর মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে অর্থাৎ টাকার দাম কমেছে। সার্বিক অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাপে পড়েছে, গ্রামের মানুষ কাজের সন্ধানে শহরে এসে অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত হচ্ছেন। গ্রাম-শহরের মধ্যে নানা সূচকের বৈষম্য কমলেও গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের অভাবে সেই অগ্রগতি পেছনের দিকে ফিরতে শুরু করেছে। যেমন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২-এ দেখা গেছে, দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭। আর পিপিআরসির ২০২৫-এর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সে হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে।

পিপিআরসির সমীক্ষায় পরিলক্ষিত গ্রাম-শহর বৈষম্যের বিশেষ কয়েকটির দিকে নজর দেওয়া যাক। গৃহ ক্যাটাগরিতে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের ১৬ দশমিক ৬ এবং শহরের ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ উত্তরদাতা পাকা বাড়িতে বাস করেন। গ্রামের ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ ও শহরের ২৯ দশমিক ২ শতাংশ উত্তরদাতা টিনশেড বাড়িতে বাস করেন। গ্রাম এলাকার ৯১ দশমিক ৫ ভাগ উত্তরদাতা ও শহরের ৫৯ দশমিক ৮ ভাগ উত্তরদাতা নিজগৃহে বাস করেন। এসব তথ্য থেকে সম্পদের মালিকানা বৃদ্ধির একটি বিশেষ দিক উঠে এসেছে।

সুপেয় পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে শহরের তুলনায় গ্রাম সামান্য এগিয়ে আছে। গ্রামের উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশ সুপেয় পানি পান, অন্যদিকে শহরে এই হার ৯৭ দশমিক ৪ শতাংশ। বিদ্যুৎ-সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। গ্রামে বিদ্যুৎ-সংযোগের হার ৯৮ দশমিক ৩, শহরের ৯৮ দশমিক ৭ শতাংশ। কিন্তু বিদ্যুৎ-সংযোগ শেষ কথা নয়। বিদ্যুৎ থাকা ও না-থাকার (লোডশেডিং) ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের চিত্র এক নয়।

শহর ও গ্রামে চিকিৎসা ব্যয় বেশি

মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের উত্তরদাতাদের মধ্যে পার্থক্য হলো যথাক্রমে ২৯,২০৫ : ৪০,৫৭৮ টাকা। শহরের উত্তরদাতাদের মধ্যে আয়ের চেয়ে ব্যয় করার প্রবণতা বেশি; গ্রামের উত্তরদাতারা সঞ্চয়প্রবণ। উত্তরদাতাদের আয়ের বেশির ভাগ ব্যয় হয় খাবারের পেছনে। শহরবাসী ও গ্রামবাসী উভয় শ্রেণির উত্তরদাতাদের চিকিৎসার ব্যয় বেড়েছে। জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে সম্পর্কিত রোগ বেড়েছে উভয় শ্রেণিতেই—ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, ক্যানসার ও হৃদ্‌রোগের বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। শিক্ষার ব্যয় শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি।

> গভীর নলকূপের অপারেটরের সঙ্গে প্রকল্পে অর্থ লগ্নিকারীর রয়েছে বিশেষ যোগসাজশ। ফলে কৃষক চাইলেই নিজের জমি ইচ্ছেমতো চাষাবাদ করতে পারছেন না।

পিপিআরসির ওই সমীক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, স্মার্টফোন ব্যবহারের হার গ্রামে ৭১ শতাংশ, আর শহরে ৭৯ দশমিক ৬ শতাংশ। কম্পিউটার/ল্যাপটপ রয়েছে গ্রামের ২ দশমিক ৪ শতাংশ উত্তরদাতার। শহরে উত্তরদাতাদের মধ্যে এর হার ৯ দশমিক ৬ শতাংশ। গ্রামের ৭৬ দশমিক ৮ এবং শহরের ৭৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানার যুবকদের স্মার্টফোন রয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করেন গ্রামের ৬৫ দশমিক ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা; শহরে এই হার ৭৬ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এসব তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির এক নতুন দিকের সন্ধান দিচ্ছে। ব্যয় ও ভোগের ধরনের ক্ষেত্রে বৈষম্য গ্রামের তুলনায় শহরে বেশি।

বাংলাদেশে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সম্পদের মালিকানা বাড়ছে। সিংহভাগ অর্থ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাতে। বৈষম্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান। বিদ্যমান আইন, নীতি-পরিকল্পনা জনগণের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় অধিকতর কার্যকর। এ জটিল অর্থনৈতিক সমীকরণের মধ্যে গ্রাম-শহর সমতা বা অসমতার চিত্র কীভাবে দেখা হবে, তা এক কঠিন প্রশ্ন।

কারণ, যোগসাজশের অর্থনীতির সূতিকাগার হলো শহর, গ্রাম তার জোগানদাতা। গ্রাম শুষে শহর ঝকঝকে হয়ে উঠছে। শহরের একশ্রেণির মানুষ বিত্তবৈভবের মালিক হচ্ছেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য সাদা চোখ বা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে দেখা সহজ নয়। যেমন গ্রামাঞ্চলে প্রকল্পভিত্তিক যে চাষাবাদ শুরু হয়েছে, তাতে অর্থলগ্নিকারী হলেন শহর বা আধা শহরের বিত্তবান। এ চাষাবাদের সঙ্গে জমির মালিক, মধ্যস্বত্বভোগী/গভীর নলকূপের অপারেটর এবং প্রকল্পের অর্থলগ্নিকারী জড়িত। কোনো প্রজেক্টের আওতায় একজন কৃষকের এক বিঘা জমি থাকলে তাঁর স্বাধীনভাবে চাষাবাদ করা কঠিন হচ্ছে।

গভীর নলকূপের অপারেটরের সঙ্গে প্রকল্পে অর্থ লগ্নিকারীর রয়েছে বিশেষ যোগসাজশ। ফলে কৃষক চাইলেই নিজের জমি ইচ্ছেমাতো চাষাবাদ করতে পারছেন না। কাগজপত্রে কৃষকের জমির মালিকানা থাকছে, কিন্তু বাস্তবে তিনি চাষাবাদের স্বাধীনতা হারাচ্ছেন। এভাবেই শহরে বা আধা শহরের পুঁজির প্রবেশ ঘটছে গ্রামে। কৃষিতে একধরনের নয়া উপনিবেশবাদ সৃষ্টি হয়েছে। পুকুর বা ঘের লিজের নামে লিজ লাভকারী জলাধারের ওপর একচেটিয়া মালিকানা লাভ করছেন। এসব জলাধার থেকে কেউ এক ছটাক পানি নিতে পারেন না। ফলে খরা মৌসুমে জলাধারসংলগ্ন চাষের জমিগুলো ঝুঁকিতে পড়ে। মোটকথা, গ্রামকে শাসিয়ে শহরের জোগানের উপযোগী করা হচ্ছে। গ্রাম তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। পাবলিক প্রপার্টির ওপর জনগণের মালিকানাবোধ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

গ্রাম ও শহরের বৈষম্য সমতাভিত্তিক উন্নয়ন, নাগরিক অধিকার, ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ ই স্টিগলিৎজ তাঁর *দ্য গ্রেট ডিভাইড* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বৈষম্য সমাজে বিভাজনের মূল কারণ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক নীতিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছিল। কর্মসূচিভিত্তিক উন্নয়ন-পরিকল্পনা ছিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দর্শন। সে জায়গা থেকে সরে বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক অ্যাডহক অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে প্রকল্পশাসিত দেশ।

সাধারণ মানুষের স্বার্থে কম গুরুত্ব পায়

বাংলাদেশ যে নব্য-উদারনৈতিক উন্নয়নের নীতি অনুসরণ করছে, যেখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থ কম গুরুত্ব পাচ্ছে। মোহাম্মদ তানজিমুদ্দিন খান এবং মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান তাঁদের *নিউ লিবারেল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে বাংলাদেশি সমাজ 'কল্যাণবাদ' থেকে 'বিপণন/পণ্যায়নে' রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে লাভ ও প্রতিযোগিতার যুক্তিতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ধারিত হয়।

যুগপৎভাবে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ তাঁর *ডেভেলপমেন্ট রি-এক্সামিনড : কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস অব নিউ লিবারেল বাংলাদেশ* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, আইন ও রাষ্ট্র পুঁজি সঞ্চয়ের জন্য আশোধিত হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এ কারণে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্ররা হচ্ছে আরও দরিদ্র। সমাজের এক অংশ যখন প্রচুর সম্পদের মালিক হচ্ছে, অন্য অংশ তখন মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য লড়াই করছে। মাথাপিছু আয় বাড়লেও সম্পদের অসম বণ্টনের কারণে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে না।

বৈষম্য নাগরিকদের মধ্যে অস্থিরতা ও বঞ্চনাবোধ বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তা বৈষম্য আরও প্রসারিত করে। মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গড়তে সমতাভিত্তিক ও কল্যাণমুখী অর্থনীতি এক উন্নত বিকল্প। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহজ ও সঠিক পথ ধরতে হবে।

৬ দশকের বিশ্বাসে সবসময় আছি পাশে

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

সুদীর্ঘ তিন দশকে ৪০ লক্ষ গ্রাহকের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও নির্ভরতায় দেশের অন্যতম শরীয়াহ্ভিত্তিক আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক অতিক্রম করেছে এক গৌরবময় মাইলফলক। আমাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা, বিনিয়োগকৃত অর্থের স্বচ্ছতা, সঠিক ব্যবস্থাপনা, আধুনিক আইটি ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে আপনাদের অর্থের পূর্ণ নিরাপত্তা আর এভাবেই আমরা হয়ে উঠেছি দেশের অন্যতম বৃহৎ ইসলামী ব্যাংক।

শাখা:
২২৬টি

উপ-শাখা:
৮৯টি

এজেন্ট আউটলেট:
৭৫০টি

এটিএম:
২৩৮টি

সিআরএম:
১৪টি

রপ্তানি:
২৫,৫৮০ কোটি টাকা

আমদানি:
৩৪,৩৮৪ কোটি টাকা

রেমিট্যান্স:
৯,০১৪ কোটি টাকা*

*(ডিসেম্বর, ২০২৪)

মোট আমানত:
৫৪,৪১১ কোটি টাকা

মোট বিনিয়োগ:
৫০,৩৯৫ কোটি টাকা**

**(জুন, ২০২৫)

ব্যাংকিং সেবাসমূহ

- কর্পোরেট ডিপোজিট
- এসএমই ডিপোজিট
- রিটেইল ডিপোজিট
- ইয়ুথসেভার অ্যাকাউন্ট
- সেভিংস প্লাস ডিপোজিট
- কারেন্ট প্লাস অ্যাকাউন্ট
- অ্যাডভান্টেজ ডিপোজিট স্কিম

- পারসোনাল ইনভেস্টমেন্ট
- অটো ইনভেস্টমেন্ট
- হোম ইনভেস্টমেন্ট
- সেমি-পাকা হোম ইনভেস্টমেন্ট
- কর্পোরেট বিনিয়োগ
- হজ ডিপোজিট স্কিম

- নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ
- সিএমএসএমই বিনিয়োগ
- পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও কৃষি বিনিয়োগ
- মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ বিনিয়োগ স্কিম
- কৃষি বিনিয়োগ
- স্কুল ব্যাংকিং

- লা রিবা ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড
- আই ব্যাংকিং ও ইসলামিক ওয়ালেট
- এজেন্ট ব্যাংকিং
- রেমিট্যান্স
- অফশোর ব্যাংকি
- গ্রিন ফাইন্যান্সিং ও সাসটেইনেবল ব্যাংকিং

এই সাফল্যের যাত্রাপথে সম্মানিত গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থার সদস্যদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমাদের বিশ্বাস অবিরাম অগ্রগতির ধারায় একসাথে আমরা পৌঁছে যাবো উৎকর্ষের শিখরে এবং আরও সুদৃঢ় করবো আপনাদের বিশ্বাসকে।

আলোকিত হোক
সমৃদ্ধির আগামী

প্রথম আলো ২৭তম বর্ষপূর্তি
প্রথম আলো'র অদম্য পথচলায় আল-আরাফাহ্
ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

16434
বিস্তারিত জানতে
কল বা স্ক্যান করুন

আল-আরাফাহ্
ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
aib
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.
Al-Arafah Islami Bank PLC.
সর্বদাই সঙ্গীবাহ

পরিবেশগত বৈষম্য, বিশৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার

পাভেল পার্থ
লেখক ও গবেষক

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার টিয়াখালী ইউনিয়নের ছয়ানিপাড়াটি গড়ে ওঠে ১৭৬০ সালের দিকে। গোধুপ্রিগাই (পায়রা) এবং টিয়াখালী রাই (টিয়াখালী) নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন এই গ্রামকে পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণের সময় উচ্ছেদ করা হয়। গ্রামের খালের ধারে ছিল এক পবিত্র প্রত্নস্থল, রাখাইন ভাষায় বলে 'চোয়ঁসাবা'। মানুষ এখানে পূজাকৃত্য করতেন। সাংগ্রেংপোওয়ে, ওয়াজআ ও ওয়াসো উৎসব আয়োজিত হতো। শতবর্ষী রাখাইন নারী প্রুগাইয়ের সাধ ছিল পূর্বজনের এই আদিভিটায় দেহ রাখার। কিন্তু রাষ্ট্রের এক উন্নয়ন প্রকল্প সেটি চুরমার করে দেয়।

শেরপুরের ঝিনাইগাতী রাংটিয়া শালবনের ধারে সমশ্চূড়া আরেক প্রাচীন কোচ গ্রাম। বাণিজ্যিকভাবে সাদামাটি, চিনামাটি ও পাথর উত্তোলনের কারণে সমশ্চূড়ার মতো সীমান্ত গ্রামগুলো এখন লন্ডভন্ড। কোচ নারীরা ধারেকাছের পাহাড়টিলা থেকে আর বন আলু, ঔষধি গাছ কিংবা লাকড়ি সংগ্রহ করতে পারেন না। জমি, জংলা, জীবিকা হারিয়ে অনেকের মতো গ্রামের কৃষক অপিলা কোচ টঙ্গীতে এসে গার্মেন্টসে কাজ নিতে বাধ্য হন।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল দেশের বৃষ্টিপ্রবণ শীতলতম স্থান। আর এমন বাস্তুতন্ত্রেই খাসি জাতিগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে পান ও ফল চাষনির্ভর বিশেষ পুঞ্জি আবাস। ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন অক্সিডেন্টাল কোম্পানির আগুনে ঝলসে যায় লাউয়াছড়া বন। গ্যাস অনুসন্ধানের নামে পরপর এই বনকে রক্তাক্ত করে ইউনোকল ও শেভরন।

লাউয়াছড়া খাসিপুঞ্জির কবিরাজ ক্লুরেন মানারকে দেখেছি দগ্ধ বনে দিনরাত উদ্‌ভ্রান্তের মতো চে রথুত, তেৎহাতি, তেৎরেথেম, তেৎখ্‌লং, ক্রালাহিড ও ক্রামুসুরি নামের জংলি মাশরুম ও ভেষজ লতাগুল্ম খুঁজতে। তেঙা হনরঅ নামের এক হলুদ কচ্ছপ, ডং চেলতিয়া নামের এক গাছশামুক, খ্র ছেরঙ্গান নামের এক সবুজ ব্যাঙ হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি।

রাজশাহীর তানোরের পাঁচন্দর মাহালিপাড়া গ্রামের কৃষক চিচিলিয়া হাসদার কোমর বেঁকে গেছে প্রতিদিন ভারী কলসি টানতে টানতে। ঝিনাখোড়ের মতো উচ্চ বরেন্দ্রর গ্রামগুলোতে পানি নেই। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ লাগাতার মেশিন দিয়ে পাতালপানি তুলে গ্রামের পর গ্রাম পানিশূন্য করেছে। খাঁড়ি, দিঘি, জলাগুলোও দখল ভরাট হয়েছে নানাভাবে।

সাতক্ষীরার শ্যামনগরের সুন্দরবনলাগোয়া বুড়িগোয়ালিনী ব্যারাকে থাকেন দিনমজুর কৌশল্যা মুন্ডা। উপকূল বাঁধ, বাণিজ্যিক চিংড়িঘের আর প্রতিদিন বাড়তে থাকা লবণাক্ততার যন্ত্রণা সামাল দিতে হচ্ছে। এক কলসি পানির জন্য হাঁটতে হয় কয়েক ঘণ্টা কয়েক মাইল। নোনাপানি ঠেলে মাছের পোনা কিংবা কাঁকড়া ধরতে ধরতে শরীরে জমেছে দগদগে ঘা। জরায়ু কেটে বাদ দেওয়ার মতো নির্দয় ঘটনা ঘটছে।

প্রশ্নহীন বহুজাতিক খননে খুন হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় পাহাড়। পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে নামা বালিতে ডুবে যাচ্ছে সীমান্তবর্তী গ্রাম, হাওর ও কৃষিজমি। পাহাড়ের ভাটিতে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের লালঘাট গ্রামের সুধাময়ী হাজংরা কৃষিকাজ হারিয়ে পাথর ও কয়লাখনিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

সুন্দরবন থেকে সুনামগঞ্জ, বিল থেকে বরেন্দ্র, উপকূল থেকে জঙ্গল কিংবা পাহাড় থেকে সমতল—দেশব্যাপী আজ বিপন্ন প্রাণ ও প্রতিবেশব্যবস্থা। এতে সর্বাধিক ঝুঁকি ও বিপদ তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবন-জীবিকায়। পরিবেশগত সংকট প্রতিনিয়ত নানামুখী আঘাত, শঙ্কা, বিবাদ, বৈষম্য তৈরি করছে। পরিবেশগত বৈষম্য বিদ্যমান কাঠামোগত বঞ্চনা ও বিবাদের সঙ্গেই জড়িত। তবে এই আঘাতগুলো সব সমাজ ও ভূগোলের জন্য সমমাত্রার ঝুঁকি ও বিপদ তৈরি করে না। সব শ্রেণি-বর্গের মানুষের জন্য এর প্রভাবও সমানুপাতিক নয়। আর প্রতিনিয়ত দশাসই হয়ে ওঠা পরিবেশগত বিশৃঙ্খলার কারণে কোনো কোনো সমাজ ও জীবনকে অন্য অনেকের চেয়ে অধিকতর ভোগান্তি সামাল দিতে হয়। বৈষম্যের গ্রন্থি ও রূপ আরও প্রকট এবং জটিল হয়ে ওঠে।

ঔপনিবেশিকতা ও পরিবেশ-বর্ণবাদ

ঔপনিবেশিকতার বৈশ্বিক চেহারা ও নিপীড়নের ধরন পাল্টাচ্ছে। তথাকথিত মুক্তবাজার ও বিশ্বায়নের নামে দুনিয়া আজ বহুজাতিক কোম্পানি ও এজেন্সির উপনিবেশে বন্দী। ক্রমাগত ডিজিটাল বর্ডারে ভাঙছে ভৌগোলিক সীমানা। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার ভোগবাদ সম্প্রসারিত হয়েছে গ্রাম থেকে শহর—সর্বত্র। উন্নত ও ধনী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলোর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও কার্বন নিঃসরণে দুনিয়া আজ অসুস্থ ও ভঙ্গুর।

পরিবেশ বা প্রতিবেশগত বর্ণবাদের কারণে ঘটমান পরিবেশগত বিপর্যয় ও ঝুঁকি সমাজের সব শ্রেণি-পেশা-লিঙ্গ-জাতি-ধর্ম-ভাষিক বর্গকে সমানভাবে বিপদাপন্ন করে না। কেবল দূষণযন্ত্রণার লক্ষ্যবস্তু নয়; বরং প্রতিবেশ আন্দোলনের নেতৃত্বেও প্রান্তিক আওয়াজকে দাবিয়ে রাখা হয়। বহুজাতিক খননের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় খনি এলাকার বননির্ভর গরিব আদিবাসী, কৃষকসমাজ, নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী মানুষ, দলিত ও সামাজিকভাবে প্রান্তিকজন।

ঢাকার মতো পরিবেশগতভাবে অতি ঝুঁকিপূর্ণ শহরের প্রান্তে বসবাসকারী নগর দরিদ্ররা পরিবেশদূষণের কারণে নগরের অন্য নাগরিকের চেয়ে অধিকতর যন্ত্রণাকাতর। দেখা যায়, রাসায়নিক গুদাম, গার্মেন্টস ও কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে মারা যায় গরিব শ্রমজীবী মানুষ। পরিবেশগত দূষণ ও বিপর্যয় যখন নিম্নবর্গের জীবনকে প্রবলভাবে প্রাণঘাতী করে তোলে, তখন তার বিরুদ্ধে সাম্য ও মর্যাদার লড়াই জাগিয়ে রাখাই পরিবেশ-ন্যায়বিচার। আজ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ-ন্যায়বিচারের লড়াই দায়িত্বশীল নাগরিকের রাজনৈতিক বাস্তবতা।

> সুন্দরবন থেকে সুনামগঞ্জ, বিল থেকে বরেন্দ্র, উপকূল থেকে জঙ্গল কিংবা পাহাড় থেকে সমতল—দেশব্যাপী আজ বিপন্ন প্রাণ ও প্রতিবেশব্যবস্থা।

যুদ্ধ, সহিংসতা, বলপ্রয়োগ ও দগ্ধ পালক

'স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (সিপ্রি) ২০২২ সালের তালিকা অনুযায়ী শীর্ষ ১০টি অস্ত্র কোম্পানিই যুক্তরাষ্ট্রের, ৩টি চীনের, বাকি ২টি রাশিয়া ও যুক্তরাজ্যের। দুনিয়ায় এত অস্ত্রের ঝনঝনানি কেন দরকার?

প্রতি ১০ সেকেন্ডে এই পৃথিবীতে একটি বাচ্চা ক্ষুধার কারণে মারা যায়। অপুষ্টির কারণে বছরে প্রায় ৩০ লাখ শিশু কাঠামোগতভাবে খুন হয়। প্রতিদিন প্রায় ১০ লাখ শিশু না খেয়ে ঘুমাতে যায়। এসব উপাত্ত হয়তো অস্ত্র কোম্পানি বা বিশ্বনেতৃত্বকে স্পর্শ করে না। অস্ত্রবাণিজ্য ও সশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ জারি রেখে কোনোভাবেই প্রকৃতির সুরক্ষা এবং পরিবেশগত বৈষম্য বিলোপ অসম্ভব।

বহুজাতিক কৃষিবিষ কোম্পানির দূষণে আজ জমি থেকে জীবন—সবকিছু আক্রান্ত। গ্লাইফোসেট প্যারাকোয়াট, কার্বোফুরানের মতো সংহারী বিষ ঢুকে গেছে প্রকৃতির খাদ্যমালায়। কেবল রাসায়নিক বিষ নয়; পৃথিবীর বিরুদ্ধে দশাসই হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আজ প্লাস্টিক। বহুজাতিক বলপ্রয়োগের কারণে ঘটমান দূষণ নানামুখী পরিবেশগত বিশৃঙ্খলার শিকল পোক্ত করছে। এই বৈষম্য বিশৃঙ্খলা নিম্নবর্গের টিকে থাকার সংগ্রামকে আরও জটিল, দুঃসহ, শ্রমঘন এবং অতিব্যয়ী করে তুলছে।

বট, বাবুই, বনরুই বা বিন্নি ধানের রাষ্ট্র

বাংলাদেশে, এখনো, রাষ্ট্র কিংবা এমনকি নাগরিক পরিসরেও পরিবেশ—প্রশ্নটি প্রবলভাবে অ্যাথনোপোসেন্ট্রিক (মানুষকেন্দ্রিক)। বাজেট থেকে বিদ্যায়তন, উৎপাদন থেকে উৎকণ্ঠা, আহার থেকে আশ্রয়—সবকিছুই কেবল মানুষের জন্য। মুক্তিযুদ্ধের পর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তরতর। কিন্তু নিদারুণভাবে নিখোঁজ হয়েছে বাঘ, শকুন, হাতি, বনরুই কী বটগাছ। চারপাশে তৈরি হয়েছে অনেক নতুন যন্ত্রণাময় পরিবেশ-বিশৃঙ্খল শব্দভান্ড। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ, দূষিত পানি, বননিধন, পাহাড় কাটা, বৃক্ষ উজাড়, কালো ধোঁয়া, ইটের ভাটা, কৃষিজমি হ্রাস, নদী দখল, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, সিসাদূষণ। পরিবেশগত এই বিপর্যয় মূলত করপোরেট ভোগবাদ আর বিনাশী উন্নয়ন বাহাদুরির ফলাফল।

পরিবেশগত সংকট ও বৈষম্যের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আঘাতের দাগ একাকার হয়ে সামাজিক বঞ্চনার রেখাকে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলছে প্রতিদিন। এই দেশে কেবল মানুষই জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি; দেশের নদী, পাহাড়, বন, জমিন, প্রকৃতি, শস্যদানা—সবারই জনসংগ্রামে অবদান আছে। তাহলে আজ পাখির লাশের হোটেল কেন থাকবে? বন্য প্রাণী বা গাছরা কেন খুন হবে প্রশ্নহীন? তিলবাজাল, পোড়াবিন্নি, নোনাখচি, রাতা, খবরক, গিগিদ্দিম, রাঁধুনিপাগল, লক্ষ্মীদীঘা, তালমুগুর, পঙ্খিরাজদের কেন তাদের বাসস্থান থেকে বাস্তুচ্যুত করা হবে! আর তুলসীমালা, গন্ধ কস্তুরি ধানগুলোকে কেন জুম থেকে জমিন উচ্ছেদ করা হবে?

সাংবিধানিক অঙ্গীকার করলেও রাষ্ট্র দেশের প্রাণ, প্রকৃতি, পরিবেশ সুরক্ষার দর্শনকে সর্বপ্রাণের জন্য সর্বজনীন করতে পারেনি। জাতীয় সংসদ থেকে জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে বিপজ্জনক রাসায়নিক বিষের বরাদ্দ আর তীব্র বায়ুদূষণ বহাল রাখলে মৌমাছি কীভাবে মধুরস রোজগার করবে? হাতির বসতি কোরিয়ান ইপিজেড বা লজ্জাবতী বানরের গ্রাম বহুজাতিক কোম্পানির জিম্মায় চলে গেলে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? রাষ্ট্র কি প্রকৃতি থেকে সব প্রাণকে জবরদস্তি করে তুলে এনে বন্দিশালা বানাতে চায়?

প্রাণ ও বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি, সমষ্টি ও বহুত্ববাদকে খারিজ করে রাষ্ট্র কেবল মানুষের জন্যই সংস্কার ও রূপান্তর চিন্তা করতে পারে না। এই কর্তৃত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ ও প্রাণ-প্রকৃতির ভেতর নির্মম জুলুম, বাইনারি এবং সংঘাত জিইয়ে রাখে। জুলাই অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি এই কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। সর্বপ্রাণের সর্বজনের পরিবেশ ন্যায়বিচারের প্রশ্নে এই আওয়াজ জাগিয়ে রাখা জরুরি।

সাদা পাথর তোলার পর সিলেটের এই অঞ্চল এ রকম বিরান হয়েছে। ছবি : প্রথম আলো

‘সঠিক’ ইতিহাসের বন্দী

নাঈম মোহায়মেন

শিক্ষক, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

শহীদ মিনারে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা না হওয়াই কাম্য। ছবি : প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনার কক্ষে স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে একটি গবেষণাপত্র পড়ছিলাম। হঠাৎ একজন দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, ‘আপনারা সব সময় সঠিক ইতিহাস তুলে ধরবেন, শুদ্ধ ইতিহাস।’ একই বছর যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে দক্ষিণ এশিয়া কনফারেন্স প্যানেলে আলোচনা করছিলাম। আরেকজন অধ্যাপক বললেন, আমাদের প্রজন্ম নাকি ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখায় না। প্রতিবারই কথাগুলোর মধ্যে এই অশনিসংকেত শুনতে পাই—আবারও কেউ এসে ঠিক করে দেবে কোন ইতিহাসটা ‘ঠিক’ আর কোনটা ‘ভুল’।

সম্প্রতি জাতীয় আর্কাইভে দলিলপত্র ঘাঁটছিলাম। কাগজগুলো হাতে নিয়ে বুঝলাম, ফটোকপির ফটোকপি। জানতে চাইলাম, মূল দলিলগুলো কোথায়? গবেষণাগারের রক্ষক শান্ত গলায় বললেন, ‘মূল দলিল বহু আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। নতুন কোনো সরকার এলেই কেউ না কেউ আসে। দরজা খুলে দেখে, কী আছে।’ সরকার বদল মানেই হঠাৎ ঝড়ের মতো পালাবদল। সবকিছু হবে নতুন। পুরোনো সব ধুয়ে, পুড়িয়ে, গুঁড়িয়ে গায়েব করে দেওয়া হবে। আগের আমলের সব নিদর্শন নতুন শাসকের চক্ষুশূল। ফাইল, ছবি, চিঠি—সবকিছু সেই জোশের উন্মাদনায় নিঃশেষ করা হয়।

একটা পুরোনো আলোকচিত্র দেখেছিলাম—মুক্তিযোদ্ধারা দাঁড়িয়ে, চোখে আগুন। সেই ছবি এখন ব্যাংকের বিজ্ঞাপনে ঢুকে গেছে, তাদের নতুন শাখা উদ্বোধনের ঘোষণাপত্রে। ছবিটা কে তুলেছিল? কে অনুমতি দিল এভাবে ব্যবহার করতে? আরেকবার দেখি, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রবীণেরা এক টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনচিত্রে। ভাষাশহীদদের স্মরণ, কিন্তু একই সঙ্গে টেলকো মার্কেটিং? দেশপ্রেম আর করপোরেট ট্যাগলাইন, পাশাপাশি, দুজনে দুজনার।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। অন্য একটি ‘অন্তর্বর্তী’ সরকার, তাই শহীদ মিনারে রাজনৈতিক দলের চিরাচরিত দখল প্রতিযোগিতা হচ্ছে না। সেই সুযোগে আমরা আমজনতা আয়োজন করে শহীদ মিনারে গেছি। রাত ১২টার পরও ভিড়, ফুল, গন্ধ, শব্দ। বন্ধুকে বললাম, ‘অন্য একটা অনুভূতি, আমরা অবশেষে এখানে!’ স্থপতি বন্ধু সালাহউদ্দিন আহমেদ হেসে বললেন, ‘সবই ভালো, কিন্তু দেখো, সবাই ব্র্যান্ডেড হেডব্যান্ড পরে আছে। ওগুলো মোবাইল কোম্পানির।’

সালাহউদ্দিন আহমেদের কথা শুনে দমে গেলাম। আমরা যারা আশির দশকে বড় হয়েছি, তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের অনুষ্ঠান একসময় ছিল নিষিদ্ধ রীতি-রেওয়াজ। সে সময়ের জনসমুদ্র দেখে মনে হচ্ছিল, নবীন প্রজন্ম ফিরে পেয়েছে ইতিহাসচর্চার অধিকার। সালাহউদ্দিন মনে করিয়ে দিলেন, ‘এটা ইতিহাস নয়, মার্কেটিং।’ স্মৃতি আর পণ্য যখন এক হয়ে যায়, আসল বলতে তখন কী থাকে? আজকাল ইতিহাসের বিজ্ঞাপন ওঠে, স্মৃতির বিলবোর্ড নামে। আমরা হাততালি দিই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, করপোরেট-দয়া ছাড়া কি ইতিহাস হবে না?

তবে ইতিহাস এখন শুধু বিজ্ঞাপনে নয়, রাজনীতির খেলাতেও আটকে গেছে। রাজনীতিবিদেরা বারবার ঢুকে পড়ছেন ইতিহাসের তদারকিতে—দলিল ঘেঁটে, নিজেদের পছন্দমতো কাটাছেঁড়া করে। কখনো পুরস্কার দিয়ে নিজের লোক বানিয়ে কাউকে কাছে টেনে নিচ্ছে; আবার কেউ কথা না শুনলে তাদের নির্বাসনে পাঠাচ্ছে। কিছু ইতিহাসবিদ পাদটীকা, সূত্র, প্রসঙ্গ ছাড়াই ইতিহাসের চূড়ান্ত সব কিতাব লিখে ফেলছেন। সবই রাজনৈতিক অসিলার অংশ।

> ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। অন্য একটি ‘অন্তর্বর্তী’ সরকার, তাই শহীদ মিনারে রাজনৈতিক দলের চিরাচরিত দখল প্রতিযোগিতা হচ্ছে না।

ফরমায়েশি ইতিহাস যাঁরা লিখছেন, তাঁরা বুঝতে চান না, আজ যারা ক্ষমতায়, কাল তারা পতিত। আর সবকিছু যখন পাল্টে যাবে, তখন নতুন সরকার নিজেদের মতো করে আবার ‘শুদ্ধ ইতিহাস’ লিখবে। এই একই চক্র বারবার। আজকের নায়ক কালকের খলনায়ক। আমাদের রাজনৈতিক মেরুকরণ যার যার আধিপত্যের সময় তাদের দৃষ্টিকোণের বাইরে ইতিহাস চর্চা করতে দেয় না। হোক সেটা সিরাজ সিকদার, কর্নেল তাহের, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন, খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান বা মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড। আমাদের ইতিহাসে বহু ঘটনা ধূসর, স্ববিরোধী, অস্পষ্ট। কিন্তু কেউ সেই ধূসর জায়গায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে ইতিহাস বুঝতে চান না।

এমনকি আদালতও এখন ইতিহাসের বিচারক হয়ে উঠেছেন। কখনো কখনো তাঁরাও রায় দিয়ে বলেন, কোন গল্প বা উপন্যাস ‘ভুল ইতিহাস’ শেখায়। একবার এক ব্লগার বন্ধু রাতে চা খেতে খেতে বললেন, ‘সত্যিকারের ইতিহাস বলে দুনিয়ার কোথাও কিছু নেই। সব জায়গায় মেকআপ দেওয়া মুখ। কেউ গোলাপজল ছিটায়, কেউ সাজগোজ করে, তারপর ক্যামেরা অন করে।’ কার ইতিহাস সত্য—এই তর্কগুলো হতে পারত একটা ডায়ালেক্টিক, দ্বন্দ্ব থেকে নতুনের উৎপত্তি। কিন্তু সেই ডায়ালগও শোরগোল হয়ে গেছে। চিৎকার বাড়ছে, কথা বোঝা যাচ্ছে না।

উদাহরণ হিসেবে মঈদুল হাসানের *উপধারা একাত্তর : মার্চ-এপ্রিল* (২০১৪) বইটির কথা ধরা যাক। বহু প্রতীক্ষার পরে *মূলধারা ’৭১*-এর (১৯৮৫) ধারাবাহিকতায় এ বই প্রকাশিত হয়। আশির দশকে দীর্ঘ এক অবসাদের পর, *মূলধারা ’৭১* আর জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* (১৯৮৬) খুলে দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনার দরজা। *মূলধারা ’৭১* বিশ্লেষণ করেছিল তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকারের যুদ্ধ পরিচালনার জটিল

বাকি অংশ ৯ পৃষ্ঠায়

বৈষম্যবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান কি জাতিগত বৈষম্য কমাতে পারল

আলতাফ পারভেজ
গবেষক ও লেখক

মানব-ইতিহাসের প্রাচীন সমস্যা বৈষম্য। এর রয়েছে নানান রূপ, কাঠামো ও ধরন। জাতিগত ও পরিচয়বাদী বৈষম্য সম্ভবত সবচেয়ে পুরোনো রূপ। বৈষম্যের কুযুক্তি হিসেবে জাতিগত বিবেচনার বাইরেও অনেক সময় ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চলসহ নানা মানদণ্ড হাজির করা হয়।

এসব মানদণ্ডের শিকড় থাকে সমাজের পরতে পরতে, নিত্যদিনের নানা বয়ানে ও বিশ্বাসের গভীরে। ফলে বহু মনীষার স্বপ্ন আর বহু সাহসী মানুষের চেষ্টা ও উদ্যোগের পরেও জাতিগত ও পরিচয়বাদী বৈষম্য খুব বেশি কমেনি। তীব্রতার কমাবেশ থাকলেও সব মহাদেশে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বৈষম্যের নতুন-পুরোনো সব ধরন জারি রয়েছে।

বৈষম্য কমানোর চেষ্টা অনেকদিনের

তবে বৈষম্য কমানোর চেষ্টাও বৈষম্যের সমান বয়সী। গত বছর বাংলাদেশেও বৈষম্যবিরোধী একটা গণ-অভ্যুত্থান হয়ে গেল; দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে যা বেশ অভিনব ঘটনা। তবে সেই অভ্যুত্থানও বাংলাদেশে জাতিগত বৈষম্যের তীব্রতা কমাতে পারল কি? বছর পেরোতেই আমরা কিন্তু দেখছি সমাজের নানা অংশকে 'অপর' করে তোলা এবং তাদের প্রতি জুলুমের সুরাহা না হওয়া।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ছবিই বেশি চোখে পড়ে; পরিচয়বাদী জুলুম চলে সামাজিক আলো-আঁধারির মধ্যে। কিন্তু জাতিগত বৈষম্য অর্থনৈতিক বৈষম্যের চেয়েও বাড়তি কিছু। সবার সঙ্গে একই জনপদে জীবনযাপনের অনেক কিছুর অংশীদার হয়েও কোনো কোনো গোষ্ঠী বিশেষ ভিন্নতার কারণে 'অপর' শ্রেণিতে পড়ে যেতে পারে। এই অপরায়ণকে ন্যায্যতা দিতে নানা মতাদর্শেরও প্রচার চলে। কোথাও কোথাও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধরনই এমন করে রাখা হয় যে বিশেষ জাতি বা ধর্ম বা লিঙ্গের সদস্যদের 'সংখ্যাগুরু' বা 'সবল' দের সমান কাতারে আসার উপায় থাকে না। রাজনৈতিক কাঠামোটাই এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন সংখ্যায় স্বল্পরা রাষ্ট্রীয় পরিসরে সামনের সারিতে আসতে না পারে; বরং তাদের জাতীয় ঐক্যের সমস্যা আকারে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা দেখা যায়। ইদানীং ফেসবুক ও ইউটিউব ব্যবহার করে এ রকম জাতিবাদী বিদ্বেষ আন্তমহাদেশীয় চেহারা নিচ্ছে।

এ রকম জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববাদের প্রধান এক ভিত্তি হলো জাতীয়তাবাদী অহং। আবার জাতীয়তাবাদী নিজেও অনেক সময় নির্বাহী ক্ষমতার লাগাম পেয়ে শ্রেষ্ঠত্ববাদের দাবি নিয়ে হাজির হয়। এ দুইয়ের মিলন যখন সমাজের স্তরে স্তরে প্রাতিষ্ঠানিকতা পেতে থাকে, তখন সেটা ফ্যাসিবাদের চেহারা নেয়। ফ্যাসিবাদ বিশেষ বিশেষ আদর্শ, বিশ্বাস, প্রতীক ও স্লোগান ব্যবহার করে সমাজে ভেদরেখা বাড়ায়, যার প্রকাশ সহিংসও হতে পারে। বলা বাহুল্য, এসব পেরোনোর চেষ্টাও সব সমাজেই ছিল এবং আছে। বাংলাদেশেও আছে। ২০২৪ সালের আগস্টে সেই চেতনা কত তীব্র ছিল, আমরা তা দেখেছি। তখন শিক্ষার্থীসমাজের প্রত্যাশা ছিল ধর্মীয়, বর্ণগত, জাতিগত ও লিঙ্গীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে বাংলাদেশ আবার অন্তর্ভুক্তিমূলক দেশ হয়ে উঠবে। পুরোনো নেতৃত্ব, পুরোনো রাজনীতির ভুলগুলো সংশোধন করা হবে। হলো কি সেটা?

লেখক আহমাদ ছফা মুক্তিযুদ্ধের পর লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়াকে পথ দেখাবে।' অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক একটা দেশ গঠনে সামনের দিনে ঢাকা নেতৃত্ব দেবে, এখানে একটা রেনেসাঁ বা জাগরণ ঘটবে। তাতে অনুপ্রাণিত হবে আশপাশের নিপীড়িত জাতিগুলোও। পারল কি বাংলাদেশ সেদিকে দুই কদম এগোতে? চব্বিশ পেরিয়ে পঁচিশের শেষলগ্নে দাঁড়িয়ে কী দেখছি আমরা? কী পেলাম বা পেতে যাচ্ছি আমরা?

জুলাই সনদে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত কি হয়েছে

বহুল আলোচিত জুলাই সনদে এমন কী আছে, যা এ দেশে জাতিগত সংখ্যালঘু, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, দলিত বা নারীদের বঞ্চনার অবসান ঘটাবে? এসব গোষ্ঠীকে পিছিয়ে রাখার 'ঐতিহ্য' বদলাতে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোনো অঙ্গীকার আছে কি সেখানে?

যে জুলাই সনদের প্রাথমিক অধ্যায়ে ছিল অনেকগুলো সংস্কার কমিশন। ১১টি কমিশন গঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কমিশন ছিল সংবিধান ও নির্বাচনব্যবস্থা বিষয়ে। এ দুই কমিশনে ১৮ জন সদস্য ছিলেন। একজনও কি ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে রাখা যেত না? আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত ১০ সদস্যের প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনেও এ রকম কারও ঠাঁই হয়নি। এমনও হতে পারত, কমিশনের সদস্য না করা হলেও কমিশনগুলোর প্রতিবেদনে এ রকম জনগোষ্ঠীগুলোর বঞ্চনা লাঘবে প্রত্যাশিত পদক্ষেপের সুপারিশ করে তাদের জাতীয় সংস্কার প্রচেষ্টায় শামিল করা হয়েছে। সে রকম কিছু কি হলো?

> এখন শুরু হয়েছে 'ভিন্ন' দের সামাজিকভাবে অপরায়ণের কাল। এটি সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ কি না, তা সবার ভেবে দেখা দরকার।

দেশে দলিতদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনার পাশাপাশি তারা অচ্ছুতধর্মী সমস্যায়ও ভোগে। এই আদিম বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে তারা বৈষম্যবিরোধী আইন চায়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে কি বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা হতে পারত না?

১৯৫৪ সালেও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৯ আসনে পৃথক নির্বাচনব্যবস্থায় ৭২ জন ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। অথচ এখন স্বাধীন দেশে জাতীয় নির্বাচন শেষে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধি থাকেন গড়ে ২০ জনের মতো। নির্বাচন সংস্কার কমিশন বা জাতীয় ঐকমত্য কমিশন রাজনীতিবিদদের অন্তত জনসংখ্যার হিস্যা অনুযায়ী এসবের সংশোধনমূলক কিছু পথ দেখাতে পারত।

সবাই বলছে আমরা 'দ্বিতীয় রিপাবলিকে' আছি! দ্বিতীয় রিপাবলিক প্রথম রিপাবলিকের চেয়ে ঠিক কী কী কারণে আলাদা? বৈষম্য ও বঞ্চনার পুরোনো গুদামগুলো পর্দা দিয়ে আড়াল করে রেখে কি বাংলাদেশ আদৌ নতুন কোনো বন্দোবস্ত গড়তে পারল? সমাজের নিচু তলায় কান পাতলে নিশ্চয়ই আমরা তার উত্তর পাব।

দ্বিতীয় রিপাবলিকে দলিত কলোনিগুলো, দূর পাহাড়ের গ্রামগুলো, মূক-বধিরের মতো গুটিয়ে থাকা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পাড়াগুলোকে সমমর্যাদা আর পূর্ণ নিরাপত্তাবোধে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে যা দরকার ছিল, গত ১৫ মাসে তার উল্টো অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে।

কেবল জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নয়, প্রধান ধর্ম ও প্রধান জাতির ভিন্ন তরিকার মানুষেরাও সরাসরি শারীরিকভাবে আক্রান্ত হলো বারবার। কেবল বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে দেখলাম আমরা। বিরাগহীন ও বাধাহীনভাবে পীর-ফকিরদের মাজার ভাঙচুর হয়ে চলেছে। নারীদের বেলায়ও বঞ্চনা কমানোর বদলে ভীতি ও অস্বস্তির আবহ বাড়ল। সংসদে বা ভূসম্পদে ন্যায়ানুগ হিস্যার সুরাহা তো কিছুই হলো না, বরং সাবেগাধ্যে রাস্তাঘাটে পোশাক-আশাকের কারণে তাদের হয়রানির খবর বের হয়। জবরদস্তি মানুষের চুল কেটে দেওয়ার দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই দেখা যায়। এসব ফ্যাসিবাদের পুরোনো চর্চা অতীতে বিভিন্ন দেশেও ছিল। আমরা কি আসলেই সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদের বিপদ শনাক্ত করতে সক্ষম? পাহারা বসিয়ে লালবাগে সেতার বাজিয়ে না হয় বোঝাতে চাইব যে সংস্কৃতি নিরাপদে আছে; কিন্তু ইতিহাস তো এই যে গত এক দশকে আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গনে অন্তত দুবার আগুন দেওয়া হয়েছে।

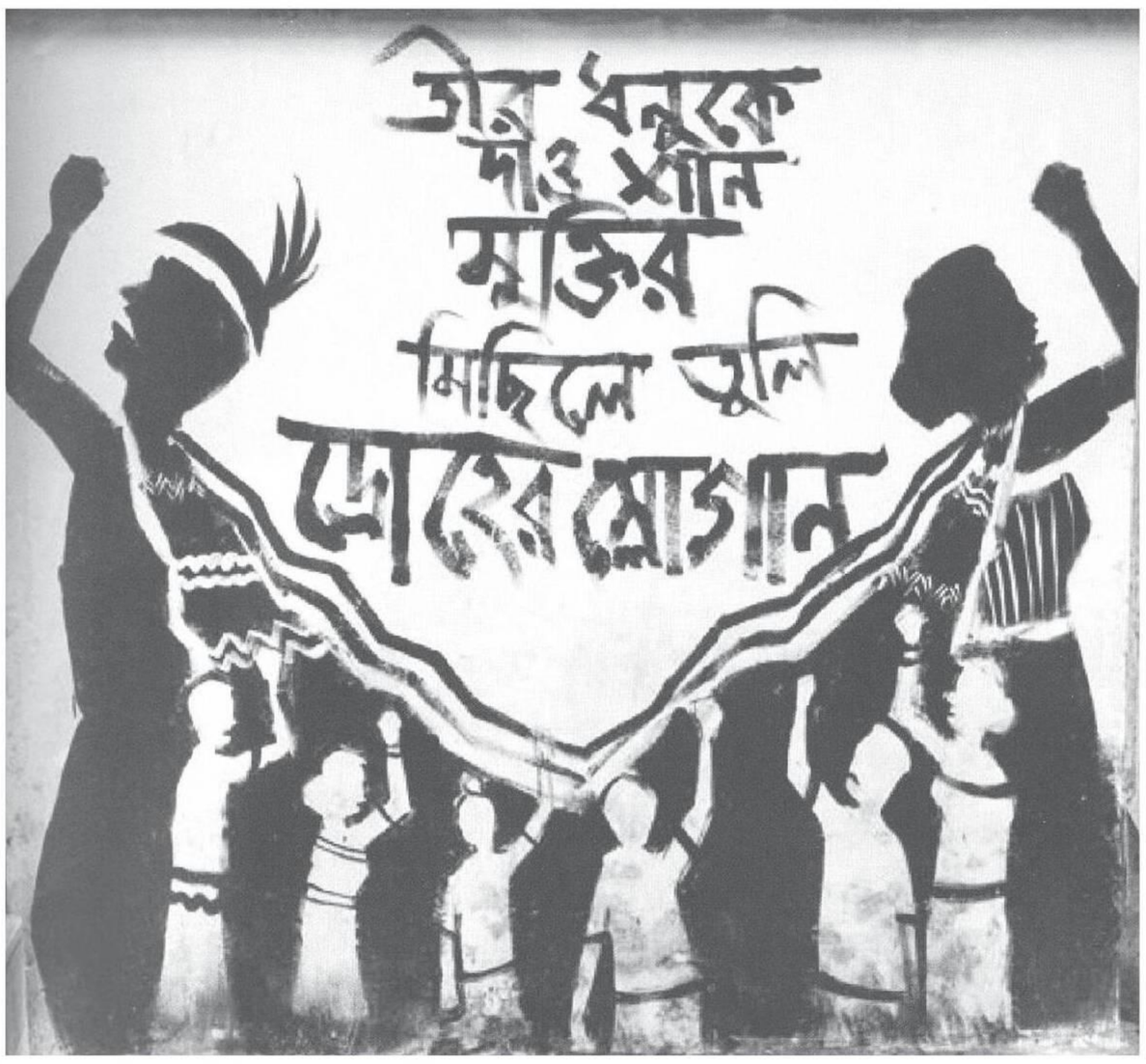

ঢাকার ফার্মগেটের দেয়ালে গ্রাফিতি। ছবি : *৩৬শে জুলাই* বই থেকে

সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ কি না

অতীতে সব সরকারের আমলে আমরা ভিন্নমতাবলম্বীদের রাষ্ট্রীয় গুম-হত্যা-দমন-পীড়ন ইত্যাদি দেখেছি। সদ্য বিগত সরকারের আমলে এসব নতুন উচ্চতায় গিয়েছিল। এখন শুরু হয়েছে 'ভিন্ন' দের সামাজিকভাবে অপরায়ণের কাল। এটি সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ কি না, তা সবার ভেবে দেখা দরকার।

বাংলাদেশের সমাজের এখনকার ছবি ও ভবিষ্যৎ অভিমুখ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের অভ্যুত্থান ও '৩৬ জুলাই' য়ের চেতনার সঙ্গে মিল রেখে এগোচ্ছে কি না, তা ভেবে দেখতে পারেন সবাই। নইলে ওই তিন গৌরবময় অর্জনের পথ করে দেওয়া শহীদদের মর্যাদা রাখলাম কোথায় আমরা? শহীদের মর্যাদা কি তবে কেবল মিউজিয়াম বানিয়ে শোধ করব?

এমন প্রশ্নও উঠতে পারে যে আমাদের পরিচয়বাদী বৈষম্য ও বিদ্বেষ কমানোর সুযোগ এখনো আছে কি না? বঞ্চিত জনগোষ্ঠীগুলোকে ভীতি, অপমান আর অসমতার জায়গা থেকে এখনো উদ্ধার সম্ভব কি না? আছে। সে জন্য আগামী সংসদকে কাজে লাগিয়ে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর সাংবিধানিক রক্ষাকবচ সৃষ্টি করতে হবে; প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাস, পছন্দ, নাগরিক অধিকারসহ জীবনযাপনের পূর্ণ নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে হবে। তবে এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন, তা হলো সব বা দঙ্গলের সহিংসতা থেকে সমাজকে বাঁচানো, নৈরাজ্য দমন করা, স্বাধীন জীবনযাপন ও সাংস্কৃতিক চর্চায় সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেকোনো দেশে নাগরিকদের এটা ন্যূনতম চাওয়া। দুর্ভাগ্যজনক হলো, এই ন্যূনতম চাওয়া বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের সরকারের কাছে বেশি চাইতে হচ্ছে।

আহমাদ ছফাদের অনুযান মেলেনি। বাংলাদেশ এখনো অন্যদের পথ দেখাতে পারেনি। রেনেসাঁও ঘটেনি।

ক্রোড়পত্র সম্পাদক : এ কে এম জাকারিয়া; সহযোগিতায় : পল্লব মোহাইমেন; অঙ্গসজ্জা : আনিসুজ্জামান সোহেল, গ্রাফিকস : আমিনুল ইসলাম

বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ
নগদ
ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন

সরকারি
সব ভাতা ও উপবৃত্তি
সব সময়ই আসে নগদে

এই ক্রাচটি
মো. গিয়াস উদ্দিনের
পা হারানোর পর, এই ক্রাচে ভর দিয়েই চলাফেরা করেন। সরকারের দেওয়া প্রতিবন্ধী ভাতা আনতে, তাঁকে এখন আর কষ্ট করে কোথাও যেতে হয় না। নিজের নগদ একাউন্টে ভাতা পাচ্ছেন খুব সহজে।

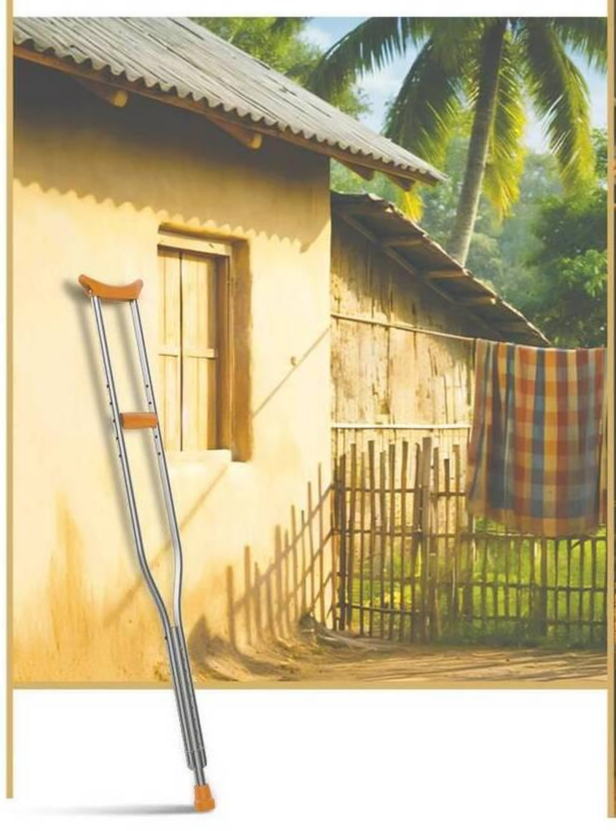

এই লাঠিটা
মো. জাকির হাসানের
৭০ বছর বয়সে, তাঁর হাঁটা-চলার সহায়। সরকারের দেওয়া বয়স্ক ভাতা আনতে, এখন আর লাঠিতে ভর দিয়ে তাঁকে কোথাও যেতে হয় না। নিজের নগদ একাউন্টেই ভাতা পাচ্ছেন নিরাপদে।

এই শাড়িটা
মিতু খাতুনের
বিধবাদের সাদা শাড়ি পরতে হয়- এই প্রচলিত নিয়মের মধ্যেও, মিতুর ইচ্ছে করে পছন্দের অন্য কোনো রঙের কাপড় পরতে। এখন তিনি সরকারের দেওয়া বিধবা ভাতা পাচ্ছেন নিজের নগদ একাউন্টে। সেই টাকা দিয়েই তিনি তাঁর ছোট ছোট ইচ্ছাগুলো পূরণ করছেন।

রঙ পেন্সিলগুলো
সাবিহার
পড়াশোনার পাশাপাশি সাবিহার আঁকাআঁকির ব্যাপারে আগ্রহ অনেক বেশি। সরকারের দেওয়া উপবৃত্তির টাকা চলে আসে সাবিহার মায়ের নগদ একাউন্টে। সেই টাকা দিয়েই পূরণ হচ্ছে সাবিহার আঁকাআঁকি সহ আরো অনেক স্বপ্ন।

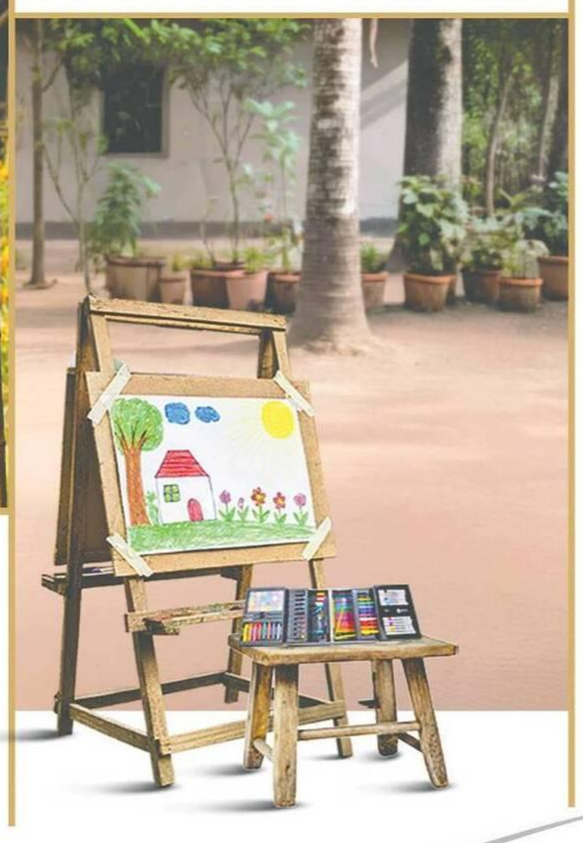

আজই নগদ একাউন্ট
রেজিস্ট্রেশন করুন
আর বিনা খরচে গ্রহণ করুন
ভাতা ও উপবৃত্তির টাকা।